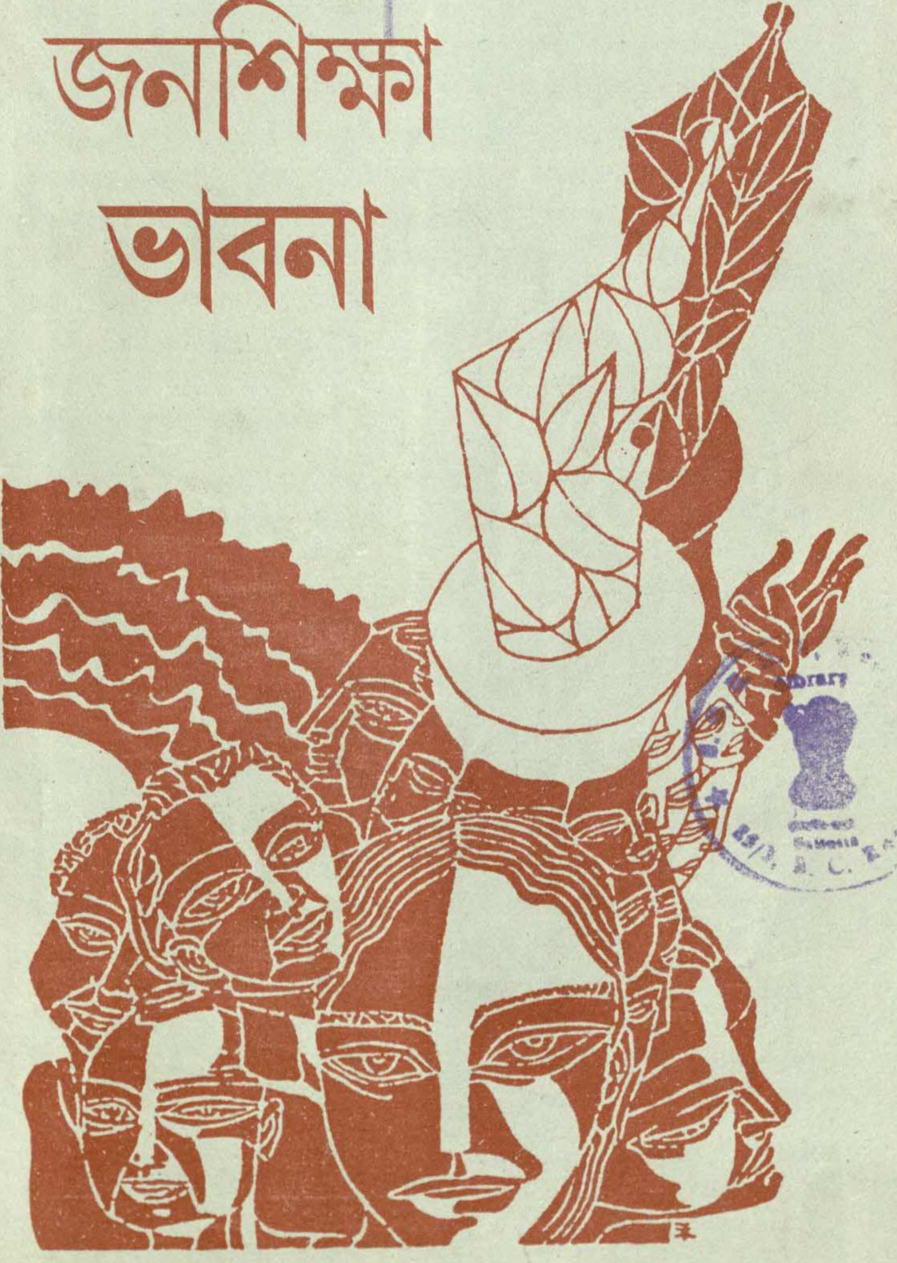
জনশিক্ষা ভাবনা



কেন এই পত্রিকা?

সারা ভারত জুড়ে এখন চলছে জনশিক্ষার অভিযান। চলছে সাক্ষরতার নানা প্রয়াস। আমাদের রাজ্যেও এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষর হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের সচেতনতা বাড়ছে, দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। এঁরা যদি আরও এগিয়ে চলার গতিপথ না পান, এঁদের উদ্বুদ্ধ চিন্তাশক্তি যদি বিশ্লেষণী ক্ষমতায় শাণিত না হয়ে ওঠে, তবে এঁদের সৃজনশীলতা প্রায় শূন্যতায় পর্যবসিত হবে। সাক্ষরতা বাড়বে, কিন্তু সমাজ স্থিতাবস্থায় থাকবে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হাজার বছরের পুরোনো মতকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। এ থেকে মুক্তির জন্য চাই চিন্তার তীক্ষ্ণতা, ভাবনার স্বচ্ছতা, চাই প্রবহমান শিক্ষার এক নিরন্তর স্রোত। এই পত্রিকা হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে মত-বিনিময় ও বিতর্কের একটি মঞ্চ — এই আমাদের আশা।

কীভাবে রচনা পাঠাবেন?

সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের কাছে এই আন্দোলনের নানা দিক সম্বন্ধে রচনা পাঠাবার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। সাদা কাগজের একদিকে পৃষ্ঠার ডানদিকের দুই তৃতীয়াংশে স্পষ্টাক্ষরে নাতিদীর্ঘ লেখা চাই। প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর বিবেচনাকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে হবে। প্রকাশিত রচনাগুলিতে যে মত ব্যক্ত হয়, তা লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতের মিল নাও থাকতে পারে।

কীভাবে গ্রাহক হবেন?

বছরের যে কোনো সময় থেকে পত্রিকাটির গ্রাহক হওয়া যায়। বছরে চারবার এটি প্রকাশিত হয়। সরাসরি নিলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ (১০.০০) টাকা। নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে টাকা পাঠিয়েও গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য চল্লিশ (৪০.০০) টাকা। দুই, তিন বা চার বছরের গ্রাহকও হওয়া যায়। এক কালীন এক হাজার (১০০০.০০) টাকা জমা দিয়ে পত্রিকাটির আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিভাগ
সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি
২৫/২, বারোয়ারিতলা রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১০
দূরভাষ : ২৪৭৭-০৩১৭

‘সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি’ কেন?

জনশিক্ষার জগতে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যেন মৈত্রর নামাঙ্কিত আমাদের প্রতিষ্ঠান ‘সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি’। গত ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে ট্রাস্ট হিসাবে এই সমিতি সরকারিভাবে নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

৫ জুন ১৯৯৬ তারিখে সত্যেন মৈত্র প্রয়াত হবার পর তাঁর স্মৃতি ও আদর্শকে অম্লান রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। সত্যেন মৈত্রর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর কাছে আমরা শিখেছি, তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ও আদর্শ নিষ্ঠায় আমরা প্রাণিত হয়েছি। তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন আমরা বোধ করেছি। তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করাকে সমাজ-স্বার্থের একান্ত অনুকূল বলে আমরা মনে করেছি। তাঁর গুণমুগ্ধ ও জনশিক্ষায় আগ্রহী বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় কয়েক বছর আগেই আমাদের সমিতির সূচনা হয়েছে। বেশকিছু কাজ আমরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছি। চারটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি ঃ

(১) সত্যেন মৈত্রর স্মৃতি রক্ষা।

(২) জনশিক্ষার চলমান কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

(৩) জনশিক্ষা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ।

(৪) গবেষণামূলক কাজ।

এই লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি।

জনশিক্ষা ভাবনা

দ্বিতীয় বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবহমান শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে

আমাদের দেশে বর্তমান ধরনের প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। পরবর্তীকালে একবার তা সংশোধিত হয়। এখন দেশের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২৪টিতে এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। সাকুল্যে ৬০০ জেলার মধ্যে ২৯৬ জেলা এর আওতাভুক্ত হয়েছে (নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত)। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলার সবকটি জেলাতেই চালু হয়েছে এই কর্মসূচি। জেলার সংখ্যার দিক দিয়ে এই কর্মসূচি রূপায়ণে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (৪২টি)। কিন্তু অনুমোদিত জনশিক্ষা কেন্দ্রের (CEC/NCEC) সংখ্যা সবথেকে বেশি (৩৩,৪৭৭ টি) পশ্চিমবাংলাতেই। এগুলি পরিচালনার জন্য বিগত দু তিন বছরে কেন্দ্রের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে পশ্চিমবাংলাই সর্বাধিক অর্থ-বরাদ্দ পেয়েছে।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে আমাদের রাজ্যের বর্ধমান ও বীরভূম জেলার প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। সর্বশেষ অনুমোদনপ্রাপ্ত জেলাটি (মে, ২০০৫) হল মালদা। বিগত প্রায় এক দশক ধরে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে রাজ্যের জনশিক্ষা কর্মীরা এক মিশ্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি। দেখা যাচ্ছে এই কর্মসূচিতে বহুমুখী শিক্ষা ও বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ আছে। বর্ধমান, হুগলী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু জনশিক্ষা কেন্দ্র একটা সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। স্বল্প সাক্ষরদের গ্রন্থাগার, আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাক্ষরতা চর্চা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আবার ধারাবাহিকতার অভাব পরবর্তী সময়ে সর্বস্তরে হতাশার সৃষ্টি করেছে।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের দলিলে প্রবহমান শিক্ষাকে অভিযান হিসাবে না দেখে

গণ্য করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি চলমান কার্যক্রম হিসাবে। বলা হয়েছে, এই কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রগুলির কোনও ঘর নেই। এই নড়বড়ে অবস্থায় কর্মসূচিটি কতটা সফল হতে পারে?

আমরা একান্তভাবেই মনে করি শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গঠনের জন্য প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচিকে চালিয়ে যেতেই হবে। তবে চালাতে হবে এর অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলিকে দূর করে, একে পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসনিক সহায়তা দিয়ে। আর এই কর্মসূচিকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল রাখতে হলে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই হবে। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হোক — এই আমাদের দাবি।

সমিতির উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য

শ্রী মানস কমল চৌধুরী

আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

ফ্রেইরীয় চিন্তার আলোকে জনশিক্ষায় জনসংযোগের ভূমিকা

বিমান বসু*



জীবনানন্দ সভাগৃহে ফ্রেইরির জন্মদিনে ভাষনরত বিমান বসু

আমি শুরুতেই পাওলো ফ্রেইরির ৮৫ তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইণ্ডিয়ান পাওলো ফ্রেইরি ইনস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো। অভিনন্দন জানাবো আপনাদের যাঁরা এই শুভদিনে শুভ সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছেন পাওলো ফ্রেইরি ও তাঁর যে system of education, সে সম্পর্কে আলোচনা শুনতে। ফ্রেইরি সেইসব গুণিজনদের একজন, যাঁরা আমাদের দেশের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষালাভ করে সমাজের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে নিজেদের জীবন নিবেদিত করেছিলেন।

এখানে আলোচনা করা হয়ে গেছে পণ্ডিত অনেক রকমের আছেন। ডঃ জলধর মল্লিক তাঁর key note address-এ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বলেছেন, আবার গজদন্ত মিনারে আসীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও বলেছেন। এ দুটোর কোনোটাই ফ্রেইরির

**১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে জীবনানন্দ সভাগৃহে ফ্রেইরির জন্মদিনে বিশিষ্ট জননেতা ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিমান বসু কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের মূল অংশ।*



ফ্রেইরির জন্মদিনে ভাষন দিচ্ছেন জনশিক্ষা মন্ত্রী নন্দরানী ডল

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। না তিনি ছিলেন গজদন্ত মিনারে বসে পাণ্ডিত্য ফলানোর জন্য একজন বিশেষ ব্যক্তি; না পণ্ডিতমন্য ব্যবহারের একজন প্রতীক। তাঁর জন্ম সামরিক বিভাগেরই এক কর্মচারীর ঘরে। তাঁর পিতা তাই ছিলেন। কিন্তু সামরিক জুন্টা, সামরিক শাসকরা কখনো কাউকে রেহাই দেয় না। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পরে ফ্রেইরির পড়াশুনায় একটু ছেদ পড়ে। কিন্তু তা তিনি অচিরেই অতিক্রম করেছিলেন এবং যথাযথ শিক্ষার অধিকারী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন, যা তিনি জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে বিস্তারিতভাবে সেই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ফ্রেইরির কাজের জগৎ ছিল লাতিন আমেরিকা। পর্তুগিজ আধিপত্য, যেমন পর্তুগিজ ভাষা জোর করে চাপিয়ে দিয়ে ব্রাজিলীয় জনগণের উপর যে ঔপনিবেশিক শাসন চলছিল, সেই ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা শুনেছেন আপনারা key note address-এর মধ্য দিয়ে। তাঁকে কারান্তরালে থাকতে হয়েছে। কারান্তরালে থাকাকালীন তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি বইও লিখেছেন। কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে তিনি যখন দেশান্তরী ছিলেন, তখন তিনি চিলিতে অবস্থান করেছেন। চিলির শিক্ষার হারের কথা আপনারা শুনলেন। এটা একটা অদ্ভূত বিষয়, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে, সব জায়গায় কিন্তু সমানভাবে শিক্ষা প্রসারিত হয়নি। আবার যে সব দেশে শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে, সব জায়গায় সমানভাবে তা তারা ধরে রাখতে পারেনি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি সম্বন্ধে পড়তে আমার দারুণ ভালো লাগে। এক

অদ্ভুত ব্যতিক্রমী চরিত্র। ধরুন ব্রাজিল, সেখানে হালফিল ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব দেখুন। আমি year book থেকে global position-এ দেখলাম, নারীর সংখ্যা ব্রাজিলে বেশি। পুরুষের সংখা কম। নারীর সংখ্যা সেখানে আটকোটি ছেষট্টি লক্ষ কয়েক হাজার। আর পুরুষের সংখ্যা আটকোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ কয়েক হাজার। ঠিক এই চিত্রটা আবার সব লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে নেই। একটা সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নের সম্পর্ক আছে এবং তদনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। চিলির কথা শুনেছেন। দেশান্তরী থাকাকালীন পাওলো ফ্রেইরি সেখানে শিক্ষা প্রসারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হ্যাঁ তিনি পালন করেছেন যদিও যে সরকার সেখানে ছিল, সেই সরকার জনদরদী সরকার ছিল না। তখন সেখানে আধিপত্য বিস্তারকারী রাজনীতির অঙ্গুলি হেলনে যাঁরা ওঠেন বসেন, তাঁদেরই সরকার ছিল। তথাপি চিলির সাক্ষরতার হার যিনি অগ্রসর করেছিলেন তাঁর বর্ণনা আপনারা ডঃ মল্লিকের কাছে শুনলেন, সেটা পরবর্তী সময়ে রক্ষিত হয়নি। আমরা দেখেছি চিলিতে তারপর আবার এই হার পড়ে গিয়েছিল। পড়াটা, উনি বলেছেন, কোনো সময় উপরের দিকে ওঠে, আবার কোনো সময় নীচের দিকে নামে। চিলিতে পড়াটা কিন্তু একেবারে নীচের দিকে নামার মতো পড়েছিল।

এরপরের কথাও আমরা জানি। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চিলিতে ডঃ সালভাদোর আলেন্দে এলেন এবং তারপর ফ্রেইরীয় শিক্ষাচিন্তার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যকে ধরার চেষ্টা করলেন। ধরার পর আবার সেই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে মান্য করে অগ্রসর হয়েছিলেন। হ্যাঁ, চিলিতে তখন সাক্ষরতার হার আবার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রায় ৯০ শতাংশ সাক্ষরতার হারে চিলি পৌঁছেছিল। এখন আবার একটা স্থিতাবস্থা চলছে। অনুরূপভাবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে ফ্রেইরির অনুসৃত পথ সাধারণভাবে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে। গ্রহণ করে ও কার্যকরী করে ফললাভ করেছে।

নিকারাগুয়ায় ড্যানিয়েল ওর্তেগোর নেতৃত্বে যে জনশিক্ষা ও জনসংযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ফ্রেইরীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। এর দ্বারা তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হয়েছিল নিকারাগুয়ায়। তাদের পরের কর্মসূচি ছিল এটাকে আরো দশ ভাগ বৃদ্ধি করা। সরকারের পতন হল। এখন সেখানে আবার স্থিতাবস্থা চলছে।

আজকে আমরা যখন ফ্রেইরির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে ইতিহাসের পাতা থেকে জনশিক্ষার প্রসার এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি তখন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতেই হবে। একথা আমরা

জানি যে, ভারতের মতো একটি বিশাল দেশে সরকার স্বীকৃত কুড়িটি ভাষা ছাড়াও প্রায় তিন হাজার ভাষার লিপি আছে এবং মানুষের মধ্যে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এটাও আমরা জানি যে, ভারতের মতো দেশে আটকোটি আদিবাসী মানুষের বাস, সারা পৃথিবীতে যেখানে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা তিরিশ কোটি। আর এই আদিবাসী মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। তাদের কেউ গডকে মানে, কেউ ভগবানকে মানে, কেউ নদীকে ভগবান মনে করে, পাথরকে ভগবান মনে করে, কেউ আবার সূর্যকে ভগবান মনে করে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে ভগবান মনে করে। কথাটা উল্লেখ করছি এই জন্য যে বহু ধর্মের বিভাজন ভারতের মধ্যে আছে। আর ভারতে একটা বর্ণভেদের প্রশ্ন আছে। এই বর্ণভেদের প্রশ্ন অতীত দিনে ছিল না। ঋকবেদের যুগে এই বর্ণভেদ ছিল না। পরবর্তী যুগে বর্ণভেদের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ, হিন্দু রাজত্বের সময় বর্ণভেদের জন্ম হয়েছে। এসব বিতর্কিত বিষয়। আমি এজন্য এর অবতারণা করছি না। করছি এইজন্য যে বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করে কখনোই কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করা যায় না। বাস্তব পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ, জনগোষ্ঠীর অবস্থানের বিচার বিশ্লেষণ করেই কিন্তু কর্মসূচি নিরূপণ করতে হবে। সমগ্র লাতিন আমেরিকায় দেশগুলো বেশির ভাগ ছিল স্পেনের উপনিবেশ। আর ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ, ফরাসি উপনিবেশ এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ। কোনো লাতিন আমেরিকার দেশে আমেরিকা তখন ছিল না। পরে আমেরিকার আবির্ভাব হয়। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে সবারই মূলত একটিই ধর্ম—খ্রিস্টধর্ম। আমাদের এর বিপরীত, আমাদের বহু ধর্ম। আর জনগোষ্ঠীর দিক থেকে Aboriginal বলতে যা বোঝায় বা tribal বলতে যা বোঝায়, তার সংখ্যা ওখানে খুবই কম। মোট জনসংখ্যা সমগ্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে যতটা আমাদের ভারতের তিনটি বড় রাজ্যের জনসংখ্যা তার থেকে একটু কম। আমি আজই তথ্য দেখছিলাম। যেখানে ২০১০ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য (Projected) জনসংখ্যার তথ্য আছে। তা ধরলে তখন হবে সমান সমান। কোথাও আছে ২০০৬ পর্যন্ত সম্ভাব্য জনসংখ্যা, যেভাবে থাকে year book-এ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে ভিত্তি করে। এই বাস্তব অবস্থাটাকে আমাদের বিচারে রাখতে হবে। বিচারে রেখেই পাওলো ফ্রেইরির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও মনে রাখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ যে কথা বলেছিলেন, এক একটা দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। তিনি বলেছিলেন, প্রাচ্যের যা সম্পদ আছে, যে সুন্দর মূল্যবোধের আদর্শ আছে, তাকে রক্ষা করেই পাশ্চাত্যের যা ভালো, তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর প্রাচ্যের যা খারাপ, তা পরিত্যাগ করে আমায় পথ চলতে হবে। আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি।

পাওলো ফ্রেইরির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমরা সবাই অবহিত। তাঁর নিজস্ব চোদ্দটি বই. এবং অসংখ্য লেখা আছে। তিনি অন্যদের সঙ্গে যে বই লিখেছেন তার সংখ্যা

এগারোটি। এগুলিতে তিনি সমাজ, শিক্ষা, সমাজ-মনস্তত্ত্ব এবং মানুষের যে মানবিক বিভিন্ন দিক তাকে অদ্ভূত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, যা সম্যক উপলব্ধির মধ্যে আনতে না পারলে আমাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। পাওলো ফ্রেইরির এই অবদান অমূল্য। তাঁর থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে।

আজকে মানবিক মূল্যবোধ কোন তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাও আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। আজকে যে প্রশ্ন আমি উত্থাপন করতে চাই, তা আর একজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, আমাদের সত্যেন মৈত্রর উপস্থিতিতেই আমি একটি আলোচনা চক্রে উত্থাপন করেছিলাম। আলোচনাটি হয়েছিল বারাসাতে। সেই সভাতে যেসব সাক্ষরতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের দু-একজনকে আমি এখানেও দেখতে পাচ্ছি। আলোচ্য প্রশ্নের সূত্র ধরে ব্যক্তিগত আলোচনায় শ্রদ্ধেয় সত্যেন মৈত্র বলেছিলেন 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

বারাসাতের আলোচনাচক্রে আমি ঢুকতে-বেরোতে গিয়ে পোস্টারে লেখা দেখলাম, 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব'। আমি বলেছিলাম সাদা মাটা কথা বললেই চলে না, ব্যাখ্যা করতে হবে। নইলে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকবে। যেমন ডঃ মল্লিক বললেন, সরল বিষয়। কিন্তু সরলীকৃত, তরলীকৃত বললে তা আবার অন্যরকম হয়ে যায়। যদি তরল মনে দেখা হয়, 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব,' তাহলে রাইখস্ট্যাগে যারা আগুন দিয়েছিল, তারা কি শিক্ষিত ছিল না? রাইখস্ট্যাগে আগুন দেওয়ার পর বেছে বেছে 'ইলিয়াড' 'ওডিসি' এবং সেক্সপিয়ারের কালেকশান প্রথম নামানো হয়েছিল। তারা হোমারের 'ইলিয়াড', 'ওডিসি' চিনল কী করে? খুঁজে কী করে বার করে নিয়ে আসল? কোন সেকশন থেকে বার করল? তারা কী করে শেক্সপীয়রের সমস্ত কালেকশান-গুলো বার করল? প্রথম বহ্নুৎসব তাই হয়েছিল। এবং তারপর লাইব্রেরি থেকে বই টানো এবং বইগুলোতে আগুন দিয়ে দাও। আর কাজটা কারা করেছে তা মিথ্যাভাবে প্রচার করে, তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, দমন-পীড়ন পরিচালনা করো। কিন্তু যারা করেছিল তারা কী নিরক্ষর ছিল? তারা তো আমাদের তথাকথিত শিক্ষার যে ধ্যান-ধারণা সেই শিক্ষায় সত্যিকারের শিক্ষিত ছিল। তা না হলে খুঁজে পেতে, জার্মানিতে, এভাবে বইপত্র বার করার অসুবিধা ছিল। ডঃ মৈত্র আমার বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। আজকে ডঃ সত্যেন মৈত্র নেই। কিন্তু তিনি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেটা সবসময় সশ্রদ্ধ স্মরণে রেখেই আমাদের পথ চলা উচিৎ। পাওলো ফ্রেইরিও যে কোনো শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন না।

একটু আগে ড. মল্লিক humanisation-এর বা communication-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে মানুষের কতকগুলো মজ্জাগত বিষয় থাকে। তাকে তার থেকে পরিবর্তন করতে হয়। এখন মজ্জাগত যখন বলি, রক্তে বলি না। মজ্জা একেবারে রজ্জু তে। আমাদের এখানেও নানা মজ্জাগত ব্যাপার ছিল। রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ব্যাপারে উনি খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যে, 'না করব না। মাটি নষ্ট হবে।' তখন বিভিন্ন এজেন্সির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারেতে চাপাচাপি করা হত। প্রাথমিকভাবে ফসল তো ভালো হবে। কিন্তু এখন জানি অতিরিক্ত ব্যবহারে পরে মাটিটা খারাপ হয়ে যায়, বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি ডঃ মল্লিককে বলব, এখন কিন্তু আর একটা উল্টো ধারা শুরু হয়েছে। জৈব সার ব্যবহার করার প্রশ্নে একটা আলোচনা আলোড়ন এবং আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে। আমি সুদূর পশ্চিমের ছোট্ট জেলা পুরুলিয়াতেও দেখেছি, সেখানে জৈব সার ব্যবহার করার আকর্ষণ বেড়েছে। সেখানে কাশীপুর-এর ভার্মিকালচার সেন্টারে সবসময় চাষিদের ভীড়, বিপুল চাহিদা। কুড়িটি ব্লকের জেলাতে ভার্মিকালচার সেন্টার আর কোনও ব্লকে নেই, কাশীপুর ব্লকে সেটা আছে। সেখানে তারা চাইছে ভার্মিকালচার সেন্টার ব্লকে ব্লকে তৈরি হোক। আবহাওয়ার বদল হচ্ছে। গতি ঘুরছে। আমি কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে মানুষকে কোন দিকে আমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করব?

আমাদের চেহারাটা দেখতে মানুষের মতো। এই মানুষের মতো চেহারা দেখতে আমরা সবাই কী মানুষের মতো কাজ করছি? আমি আগে বলতাম, এখন আর বলি না। অনেকে ক্ষেপে যায়। আগে বলতাম। মানুষের মতো দেখতে হলেই সবাই মানুষ হয় মা। এখানে আলোচনা হচ্ছে বলে উল্লেখ করলাম। কোনো মানবিক গুণ যদি না থাকে, তবে সমাজের পক্ষে, আমাদের মানব সভ্যতার পক্ষে তার কী প্রয়োজন আছে? আপনারা তো দেখছেন ছেলে বাবাকে খুন করছে। ছেলে মাকে খুন করছে। বাবা ঋণের দায়ে depression-এর victim হয়ে নিজে আত্মঘাতী হল, সেটা অন্য বিষয়। এটার সঙ্গে ওটার তুলনা করা যাবে না। সম্পত্তি ছেলের নামে লিখে দিতে হবে। তা নইলে মাকে খুন করছে, বা বাবাকে খুন করছে। এরা কি মানুষ? আর আজকের এই চার দেওয়ালের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে মূল্যবোধ কোন তলানিতে এসে পৌঁছোচ্ছে।

বাবা গুরুতর অসুস্থ। শুনেছে ছেলে ব্যাঙ্গালোরে একটা multinational company-তে চাকরি করে। বাবা হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়েছে। ছেলের call এল, united states এর একটি company-তে join করার জন্য। অনেকটা বড় company। কলকাতা হয়ে সে চলে গেল শিকাগোতে। কিন্তু বাবাকে দেখতে গেল না। আমি একটা লেখার মধ্যে এটা তোলার চেষ্টা করেছিলাম।

ঘটনাটা আমাকে এতো নাড়া দিয়েছিল। এরাও মানুষ। কারণ, লেখাপড়া শিখেছে। প্রযুক্তিবিদ। আপনি বলতে পারবেন না লেখাপড়া জানে না। এই সব বাস্তব বিষয়গুলো বিচার করতে হবে। ডঃ সত্যেন মৈত্র চলতি স্রোতে নিজের জীবনকে 'সুন্দর' করে গড়ে তুলতে পারতেন। অক্সফোর্ড থেকে এসে তিনি কিন্তু নিজের জীবনের জন্য কিছু করেন নি। তিনি মানুষের জন্য করেছেন।

আজকে সত্যেন মৈত্রর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমরা হাজির হইনি। পাওলো ফ্রেইরিও কিন্তু নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে কখনো কোনো কাজ করেন নি। আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁর এই সদ্‌গুণের কথা অবশ্যই সশ্রদ্ধ চিত্তে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। সমস্ত মানুষকে আলোড়িত করার জন্য, শিক্ষার আলোয় আনার প্রশ্নে ফ্রেইরি নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

তাঁর একেবারে প্রথম বই 'Educational practice for freedom'-এর মধ্য দিয়েই তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে আরও অনেক বই তিনি প্রকাশ করেন। তিনি জনশিক্ষার ক্ষেত্রে চলতে চলতেই জনসংযোগ বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যে যেখানে সাক্ষরতার কাজে যুক্ত আছি সেখানে তার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারব। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের মণিকোঠায় ঢুকে যাওয়ার, আলোড়ন তৈরি করার যে কথা তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে তিনি সাংস্কৃতিক চর্চার কথাও বলেছেন। তার উপর আলাদা একটা বইও তিনি লিখেছেন। সাংস্কৃতিক চর্চা, তার মনের খোরাকটা জোগানো, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে কাজ করা এইসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা এখনকার সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি সারা ভারতের কথা বলব না। পশ্চিমবাংলায় ২০০৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে যে অন্তবর্তীকালীন সমীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা যায় ২০০১ সালে আমাদের সাক্ষরতার যে হার ছিল ৬৯.২২ শতাংশ, তার একটু পরিবর্তন হয়েছে। এক স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষার অগ্রসর হওয়ার প্রশ্ন বিগত তিন চার বছরের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। কিছু Crash Programme জনশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে হয়েছিল, আর কিছু কর্মসূচি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পক্ষ থেকে কতগুলো জেলায় এলাকা ভাগ করে পরিচালনা করা হয়েছিল। সামগ্রিক রিপোর্টের পর্যালোচনার মধ্য থেকে যেটা বেরিয়ে আসে, তাতে এখন আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ মানুষ সাক্ষর হয়েছেন। তার মানে শতকরা ২৭ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর। এখন এই ২৭ ভাগ মানুষ নিরক্ষর হলে আমাদের লোকসংখ্যার হিসেবে তা ৯০ থেকে ৯২ লক্ষের মতো। এককোটিতে যাচ্ছে না। শূন্য বয়স থেকে ৫-৬ বছর বয়স বাদ দিলে, এটা দাঁড়িয়ে যাবে ৬৪-৬৫ লক্ষের মধ্যে। বলা ভালো ৬০-৬৫ লক্ষ। কারণ অনেকে ৫

বছরের মধ্যে বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়, যদিও ভর্তি করার নিয়ম নেই। ৬ বছরে ভর্তি করতে হয়। এখন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে জন্মের সার্টিফিকেট দেখে নেয় না। প্রথাগত শিক্ষা-কেন্দ্রে কিন্তু এই সার্টিফিকেট দেখে নেওয়া হয়। অনেক ছেলেমেয়ে আজকাল খুব advance থাকে। তারা খুব চট করে pick-up করে নেয়। তবে যাইহোক, যদি নিরক্ষর ৬৫ লক্ষও হয়, তাহলে ৬৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার কাজ করতে একটা বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতেই হবে।

উল্লেখ করার মতো সাফল্য হল, নিরক্ষতার উৎসমুখ ক্রমে বন্ধ হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বহু শিক্ষা কেন্দ্র। এই ভাবে ১৬,০০০ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র রাজ্যে গড়ে উঠেছে। আরও ৫০০০ হবে। রাজ্যে ৫২,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় একদম নথিভুক্ত। আমি বলছি না ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কথা। আমি বলছি একদম প্রথাবদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের কথা। সব ভালোমতো চলছে কি না তা পরের কথা। কিন্তু যে সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে তা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০০২ সালেও যে চিত্র ছিল, সেখানে dropout নিয়ে আমাদের খুবই চিন্তা ও ভয় ছিল। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে এবং ড. জে. পি. নায়েকের শিক্ষাসংক্রান্ত বইয়ে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আছে।

ড. জে. পি. নায়েক বহুকাল শিক্ষাসচিব ছিলেন এবং আমার ধারণা স্বাধীন ভারতে তাঁর মত শিক্ষাসচিব দ্বিতীয়বার আসেননি। তাঁর বই পড়ে আমি দেখেছি, তাঁর অদ্ভুত, প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি গভীর অধ্যাবসায় সহকারে লিখতেন। সেখানে বারবার উল্লেখ করা হয়েছিল dropout-এর কথা। ড. গুনান নিরদাল তাঁর 'Asian drama'-তে এবং তাঁর 'Poverty : Challenge in India' বইতেও একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "Dropout is the main problem in India" ভারতে শিক্ষাবিস্তার হচ্ছে, কিন্তু ক্রমাগত স্কুলছুট পড়ুয়ারা বেশিদিন শিক্ষার বাইরে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, নিরক্ষরদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ২০০২ সালের রেকর্ড অনুযায়ী রাজ্যে ১১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হত। তার আগে একসময় এই সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ, কিন্তু মিড-ডে-মিল চালু করার পর এবং সর্বব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার পর এক অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে। ২০০৫ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের রেকর্ড অনুযায়ী এখন স্কুলছুটের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৮ হাজার। কী দারুন সাফল্য!

এখন প্রশ্ন হল, যারা শিশুশ্রমিক তাদের কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে, সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করতে পারলে, প্রাথমিক ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রকৃত অর্থে শিক্ষাপ্রদানকেন্দ্র হিসেবে পরিচালনা করতে পারলে নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ হবে। আর নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করতে পারলে জনশিক্ষার ক্ষেত্রটা

বয়স্কশিক্ষার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যাবে। তবে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষদের জন্য ভারত সরকারের কোনও কর্মসূচি নেই। এমনকি রাজ্য সরকারেরও কোন কর্মসূচি নেই। তবে আমার মনে হয় একটা পথ আছে। যে সমস্ত সংগঠন মানুষের মাঝে কাজ করে, যেমন কৃষক সংগঠনের সদস্যসংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে লেখাপড়াজানা মানুষও আছে, আবার নিরক্ষর মানুষও আছে। যদি সংগঠনের লেখাপড়াজানা মানুষরা দায়িত্ব নেন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার।

সাক্ষর বলতে আমিও পাওলো ফ্রেইরির মতো বিশ্বাস করি, তা মোটেই অক্ষরজ্ঞান নয়। আমরা বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পক্ষ থেকে একসাথে বলি, সাক্ষরতা, সচেতনতা, সক্ষমতা। তিনটি মিলেই সাক্ষরতা। সাক্ষরকরণের প্রক্রিয়াই যুক্ত হবে সচেতনকরণের প্রক্রিয়ায়। আবার সচেতনকরণের প্রক্রিয়াই নিয়ে যাবে সক্ষমকরণের প্রক্রিয়ায়। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৮৩ লক্ষ। তাদের মধ্যে যাঁরা সাক্ষর তারা যদি নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষরতার অভিযান করেন তাহলে বিরাট সাফল্য আসতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে আমাদের রাজ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য এসেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের হিসাব করলে দেখা যাবে পুরুষ সাক্ষরতার হারের থেকে নারী সাক্ষরতার হার অনেক বেশি। যেখানে শতকরা ১৪ ভাগ বেড়েছে নারী সাক্ষরতার হার সেখানে পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ঘটেছে শতকরা মাত্র ৯ ভাগ। কিন্তু ওই সাফল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে এমন ব্লক খুঁজে পাওয়া যাবে, যে ব্লকে নারী সাক্ষরতার হার শতকরা ১৬ ভাগ। এইদিকে এখন বিশেষ নজর দিতে হবে।

আমাদের দেশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে কেরালা। তাদের কাছে আমাদের শেখার আছে। মিজোরামও এগিয়ে আছে। তবে এইসব জায়গায় লোকসংখ্যা কম, ভাষার ভিন্নতা কম, এর সঙ্গে ওখানে শিক্ষাপ্রসারে রয়েছে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান। আমাদের রাজ্যে জনঘনত্ব বেশি, ভাষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বেশি। এসব মনে রেখেই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে বলি সাক্ষরতার প্রকৃত কাজ করতে গেলে, জনশিক্ষা, জনচেতনার কাজ করতে গেলে ফ্রেইরিকে অধ্যয়ন করা জরুরী। তাঁর মত ও পথকে বোঝা জরুরী জনগণের চিন্তা চৈতন্যের পরিবর্তনের কর্মসূচি নেওয়ার ক্ষেত্রে, তাঁদের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার পথে তিনি এক মহান অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার আলোকে নিজেদের অবস্থানকে বিচার বিবেচনা করে, জনশিক্ষার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলব। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করে এখনও পিছিয়ে থাকা মানুষদের সাক্ষরতার আন্দোলনে যুক্ত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে সফল হব।

ফ্রেইরীয় চিন্তার আলোকে জনশিক্ষায় জনসংযোগ

— জলধর মল্লিক*

মানুষের সমাজে জনসংযোগের রয়েছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমরা এই কথা বলছি কেন? আমাদের সমাজ যোগাযোগের উপর ভিত্তি করেই চলছে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। প্রত্যেক মানুষই সামাজিক মানুষ, স্বীকার করুক বা না করুক। মানুষ সমাজের অংশ। যেমন একটা ইমারত গড়ে ওঠে অনেকগুলো ইঁট দিয়ে। কিন্তু এগুলোতে সিমেন্টে যেমন গাঁথতে হয়, তেমন মানুষগুলো গেঁথে একটা সমাজের চেহারা নেয় যোগাযোগের জন্য। বাসে করে যাচ্ছি, পাশের প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কোন কথা হল না, কে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, জানা গেল না। একটা ফারাক থেকে গেল। এই অবস্থাটা যদি সবার সঙ্গে চলত তাহলে সমাজটা বেঁচে থাকত না, গড়ে উঠত না, বিকশিত হত না। যোগাযোগের মধ্যে এই বেঁধে রাখার একটা ক্ষমতা আছে। সেই সঙ্গে আর একটা বড় কাজ যোগাযোগ করতে পারে। এটা সামাজিক পরিবর্তনের একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

যোগাযোগ বলতে আমরা কী বুঝি? সেটা হচ্ছে একটা ভাবের আদান প্রদান। কোনও ব্যক্তি বা দলের idea, that is communication। এটা নানাভাবে হয়। সেটা কথা বলে হতে পারে, ছবি এঁকে হতে পারে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হতে পারে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই ভাবের আদানপ্রদান চারটে স্তরে হতে পারে। একজন ব্যক্তির সঙ্গে আরেকজন ব্যক্তির হতে পারে। একজন ব্যক্তি একটা দলের কাছে ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেমন একজন নেতা একটা দল চালান বা ফুটবল মাঠে ক্যাপ্টেন প্লেয়ারদের পরিচালনা করেন। তেমনি উল্টোটাও হতে পারে। একটা দল একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। আর দলের সঙ্গে দলেরও ভাবের আদানপ্রদান চলতে পারে।

আরেকটা লক্ষ করবার মত বিষয় হল এই ভাবের আদান প্রদান দুভাবে হয়। উপরদিক থেকে নীচের দিকে বা নীচের দিক থেকে উপরদিকে, যদিও দ্বিতীয়টি

---

*বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে জীবনানন্দ সভাগৃহে ইন্ডিয়ান পাওলো ফ্রেইরি ইন্‌স্টিটিউটের সাম্মানিক অধিকর্তা ড. জলধর মল্লিকের প্রাথমিক (Key note) ভাষণের মূল অংশ।

খুব বাধাসাপেক্ষ এবং কমই হয়। একে আমরা বলছি Vertical Communication। অপর ক্ষেত্রে সমাজে একই আর্থসামাজিক স্তরে বা পেশাগত ভাবে একই স্তরে থাকা মানুষদের মধ্যে ভাবের বিনিময়কে বলা হয় Horizontal Communication।

তবে আদান প্রদান এই কথাটা কিন্তু সবসময় চলে না। একটা রাস্তার একদিক দিয়ে গাড়ি আসছে, একদিক দিয়ে যাচ্ছে, উঁচু নিচু আবার একমুখী রাস্তাও তো আছে। আদান প্রদান যখন হয় তখন তারমধ্যে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার থাকে। যাকে বলা হচ্ছে interaction, পাশাপাশি one way traffic-এর মত একমুখী ভাবপ্রকাশও হতে পারে। TV আমি দেখি, আমি তাকে কী ফেরত দেব? রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, মুদ্রণ এখানে আমার ফেরৎ দেওয়ার কোনও জায়গা নেই, শুধু নেওয়া। কিন্তু বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ communication হল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেখানে হয় অর্থাৎ interactive communication। এর একটা সম্ভাবনা আছে, শক্তি আছে পরিবর্তন আনার, কিন্তু এটা কি সবসময় ঘটে? না, ঘটে না। একটা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে একজন চায় তার যে অবস্থান আছে সেটা বজায় রাখার। ফলে পরিবর্তন যাতে না আসে সেটাই হবে তার যোগাযোগের রাস্তা। এইখানেই আসছে পাওলো ফ্রেইরির কথা।

উনি কতগুলো যোগাযোগের দিক তুলে ধরছেন। যেমন যার এত শক্তি আছে, যে পরিবর্তন আনতে পারে, সে কেন পারছেনা? উনি বলছেন—ওনার কাছে বাঁধন মুক্তি মানেই শোষনমুক্তি। এই বাঁধন নানারকম হতে পারে, নানান চেহারায় আসতে পারে।

পাওলো ফ্রেইরি এবং মার্কসিস্টদের মতে, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে কোন ভাব বা idea-র শ্রেণি চরিত্র থাকবে না—এ হতেই পারে না। শুধুমাত্র উপর থেকে নীচের দিকেই নয়, একই স্তরে থাকা মানুষদের মধ্যেও কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা গুপ্তভাবে এমন ভাব চালনা করা হয় যাতে তারা প্রতিবাদ করতে না পারে। প্রতিরোধ করতে বা উঠে দাঁড়াতে না পারে। তাকে পাওলো ফ্রেইরি বলছেন Culture of Silence, এটা ধর্মের নামে হতে পারে, অদৃষ্টের নামেও হতে পারে।

পাওলো ফ্রেইরি কাজ করেছেন, বিভিন্ন তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, আবার সেই তত্ত্ব প্রয়োগও করেছেন। এটাই তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই প্রয়োগ ও তত্ত্ব তিনি এক করে দিয়েছিলেন এবং তার নামও দিয়েছিলেন—Praxis, এটাই ছিল তাঁর সমস্ত কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই Praxis কী? আমি যা করি এবং তার পিছনে যে মুক্তি চিন্তা আছে এই দুটোর মধ্যে মিল ঘটানোই Praxis। এটা একটা চক্রাকারে হয়। কাজ হচ্ছে, সেই কাজ থেকে চিন্তা বিকশিত হচ্ছে, সেই

চিন্তা আবার উন্নততর কাজে প্রয়োগ হচ্ছে। Action, reflection and action। এই পথ বেয়েই আস্তে আস্তে একজন এগোতে থাকবে।

কী করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন? ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। জনশিক্ষার কাজ কিন্তু খুব নিরামিষ কিছু নয়। পাউলো ফ্রেইরির জীবন থেকে আমরা সে শিক্ষা নিতে পারি। তিনি কাজ করছেন, ১৯৬৪-এ, পুলিশ এল, তাঁকে জেলে পুরে দিল। তিনি কিন্তু কিছুই করেন নি। সাক্ষরতার কাজ করেছেন, জনশিক্ষার কাজ করেছেন। তখন তিনি দেখলেন, সামনে দুটো রাস্তা আছে। এক, জেলে পচে মরা, দুই, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, তাতে কাজ চলবে, চিন্তার প্রচার চলবে। উনি তাই করলেন। পনেরো বছর তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হল। দেশে সামরিক সরকারের পতন ঘটারও কিছুদিন পর ১৯৭০-এ তিনি পাসপোর্ট পেলেন।

দেশ ছাড়ার পর তিনি প্রথম আশ্রয় পান চে গুয়েভারার বলিভিয়ায়। এরপর তিনি যান চিলিতে, সেখানে তিনি প্রচুর কাজ করেন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে কতগুলি মিথ তিনি ভেঙে দিলেন। আমাদের আগে ধারণা ছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশ না হলে সকলের জন্য শিক্ষা হতে পারে না। তিনি দেখালেন সেটা হয়, করা যায়। আজ সেখানে ছিয়ানব্বই ভাগের উপর মানুষ সাক্ষর। বছর দুয়েক আগে বইমেলায় চিলি ছিল আমাদের অতিথি দেশ।

সেখানে প্রথম তিনি যে কাজটা শুরু করলেন সেটা হল— Research and Training Institute for Agrarian Reform (ICIRA)। এখানে কাজ করাকালীন তিনি একটা বই বার করলেন Extension of Communicational – পর্তুগীজ ভাষায়। এটা প্রথম স্প্যানিশে হল ১৯৬৯-এ, পর্তুগীজে হল ১৯৭১-এ, ১৯৭৩-তে আমরা ইংরেজি বইটি হাতে পেলাম। বইটার নাম হল Extension of Communication।

এই বইতে তিনি অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, এই অভিজ্ঞতা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, Agriculture Extension-এর কথা। কার extension? কৃষি না কৃষকের? খুব বড় প্রশ্ন। উনি বললেন দুটো জিনিস চলে extension and communication। যাঁরা technician, কৃষিবিদ তাঁরা কৃষকের কাছে জিনিস নিয়ে আসেন dominate করার জন্য, অনেক সময় অজান্তেই হয়ত। তাঁরা তাঁদের মতো করে তা উপস্থাপনা করেন, কৃষকের মতো করে নয়। কৃষকের যে সমস্যা আছে, সে যে formula চাইছে, তার জন্য চাই communication, cultural communication। তার উপর তিনি cultural theory তৈরি করেছিলেন, cultural action তৈরি করেছিলেন। তিনি বললেন, extension এর নামে যা হচ্ছে, তা হল আগ্রাসন। উপরতলার মানুষের আগ্রাসন কৃষকের

খালি মাথায় নিজের লাভের জন্য কিছু ঢোকানো।

কিন্তু শিক্ষা এভাবে হয় না। অ আ ক খ মুখস্থ করাবো তিনি তাকে শিক্ষা বা learning বলছেন না। যা তার মুক্তির সপক্ষে কাজ করবে, সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের শিক্ষা। এখানেই আসছে তাঁর মতবাদ — Education as a practice for freedom। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মিজোরামের সাক্ষরতার হার কেরালার ঠিক পরেই সেখানে মহিলাদের সাক্ষরতার হারও দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু মহিলারা সেখানে সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণি। ওখানকার সাক্ষরতা তো যুক্তি আনছে না, অধিকারবোধ আনছে না। এই সাক্ষরতায় কে লাভবান হচ্ছে? যারা শোষণ বজায় রাখতে চায়, তারাই।

প্রযুক্তিগত সক্ষমতাই শেষ কথা নয়, মানুষটার কথাও ভাবতে হবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে all development is modernization but all modernization is not development। উনি নিজের মতো করে জানতে শেখালেন। ওপরতলার করা নয়, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে বললেন। জানার চারটি মাত্রা দেখালেন—

i) Logical – কী কায়দায় জানছি
ii) Historical – কোন পরিপ্রেক্ষিতে জানছি
iii) Rationological – এই জানার ফল কী হবে
iv) Dialogic – Communicational knowledge, কীভাবে জ্ঞান মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে

এ প্রসঙ্গে উনি বললেন, যতই কেউ বলুক না, আমি চিন্তা করেছি, আসলে সমাজ তাকে চিন্তা করতে শেখায়। তিনি বললেন যোগাযোগের ভাষা হতে হবে সরল যাতে সাধারণ মানুষ গভীর পর্যন্ত সহজে বুঝতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেন অতি সরলীকরণ বিষয়ের উপলব্ধিকে ব্যাহত না করে। এর ফলে দলগত চেতনার উদয় হবে। যাকে বলা যেতে পারে চেতনায়ন বা conscientization। এই conscientization এর দ্বারা সেই গোষ্ঠী বা দল শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির প্রশ্নে সোচ্চার হবে। এই জানা হতে হবে একটা আবিষ্কারের মত। শুধু কিছু পড়া মুখস্থ করলাম পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, তা আমি বুঝিও না, আমার বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, এ জানা কখনও মুক্তির চাবিকাঠি হতে পারে না।

জানার দুটি মুহূর্ত থাকে — Production of knowledge, অভিজ্ঞতা থেকে বা অন্য কারো থেকে জানা, দ্বিতীয় হল Discover of known অর্থাৎ যা আমি জানলাম তা আমার কাজে আসবে কীভাবে। অবশ্যই এই দুটি মুহূর্তকে পরস্পরের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে যুক্ত হতে হবে যা বর্তমানে হয়না। এইভাবেই একজন

নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর critical analysis-এর জায়গা না থাকায় আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দোকানে পরিণত হচ্ছে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে মুক্তির জন্য শিক্ষাপ্রসারের কাজ করব কীভাবে? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য তিনি নিয়ে এলেন একটি পদ্ধতি যার নাম Dialogical method। 'Dialogical' শব্দটি এসেছে 'Dialogue' থেকে। জীবনের dialogue কিন্তু নাটকের সংলাপ থেকে আলাদা। এটা কোন একতরফা শিক্ষাদান নয়, সম্মানের সঙ্গে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পারস্পরিক জ্ঞানের আদান-প্রদান। এর মধ্যে কোনো ছড়ি ঘোরানো dominating ভাব থাকবে না, তবেই তা হবে প্রকৃত dialogue।

পাওলো ফ্রেইরির মতে, সংলাপ ছাড়া যোগাযোগ হয় না এবং যোগাযোগ ছাড়া মুক্তির রাস্তা পাওয়া যায় না। যোগাযোগ কোনো হুকুম জারি করা নয় যা নীচতলার মানুষদের ভাবকে বিকশিত হতে দেয় না। শোষকরা শোষিতের মনের মধ্যে কখনও tradition-এর নামে, কখনও ধর্মের নামে একটা ভাবচিত্র তৈরি করে। তাই vertical dialogue মুক্তি আনেনা। সত্যিকারের সংলাপ হতে হবে আনুভূমিক। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আস্থার মাধ্যমে তা বিস্তৃত হয়। অন্যের মতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বিরোধিতা ও বিরোধী মনোভাব এক নয়। অন্যের চিন্তাধারা না জানলে নিজের চিন্তাধারা শোধিত হবে না। এক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা একটা বড় শক্তি। শিক্ষাকে তিনি এক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

শেষে বলা যায়, কেন আমরা পাওলো ফ্রেইরির মতবাদ নিয়ে এত কথা বলছি? কারণ, শিক্ষা মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। আর এর ফলে সমাজ বিকশিত হয়, উন্নততর হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি বই লেখেন ১৯৬৯ সালে – The role of education for humanization। তাই মুক্তির পথে শিক্ষা অপরিহার্য বিশেষত জনশিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

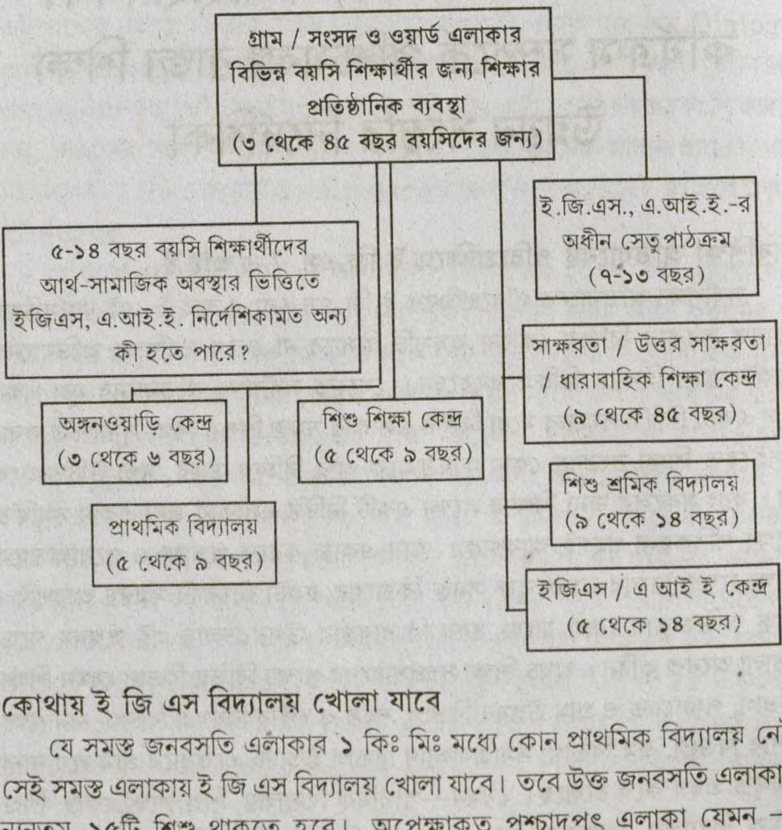
সর্বশিক্ষা অভিযানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত ই.জি.এস./এ.আই.ই. শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থার নির্দেশিকা

সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ই.জি.এস. / এ.আই.ই.

সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ই.জি.এস এবং এ.আই.ই. এই কর্মসূচিকে ভারত সরকার বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মসূচি হিসাবে না দেখে সর্বশিক্ষা অভিযানের একটা অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল লক্ষ্য হল একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করা, সেইহেতু শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রমকে আর বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা উচিত হবে না। বরং সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য একটা সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণই আবশ্যক। আর একাজ করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে যুক্ত সমস্ত বিভাগের একটা কার্যকরি সমন্বয় আবশ্যক। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সরকারি ব্যবস্থার উপর তলায় এই সম্বনয় গড়ে তোলা অনেক কঠিন। অথচ শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ যেমন শিক্ষা বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ, শহর ও পৌর বিষয়ক বিভাগ, জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, শ্রম বিভাগ, সমাজকল্যাণ বিভাগ ইত্যাদি একেবারে গ্রামস্তরে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। যেমন—প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়, সাক্ষরতা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বলা যায় উপরতলার সমন্বয় ব্যতিরেকেও শুধুমাত্র গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির উদ্যোগে গ্রাম সংসদ ও ওয়ার্ড স্তরে সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে একটা সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কাজে ই.জি.এস. / এ.আই.ই-র সাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও অংশীদার হতে হবে।

আমাদের রাজ্যে গ্রাম সংসদ ও ওয়ার্ড স্তরে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের জন্য উল্লিখিত যেসব প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে বা বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমও চলেছে সেগুলি পঞ্চায়েত ও গ্রাম শিক্ষা / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির উদ্যোগে একীভূত করে একটা সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির্কে এই সমন্বিত

পরিকল্পনার ধারণা থেকে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিতে হবে এবং তাঁরা কোন এলাকায় কতটা অংশ নিয়ে কাজ করবেন সেইভাবে প্রকল্প তৈরি করবেন।



কোথায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলা যাবে

যে সমস্ত জনবসতি এলাকার ১ কিঃ মিঃ মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেই সমস্ত এলাকায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলা যাবে। তবে উক্ত জনবসতি এলাকায় ন্যূনতম ১৫টি শিশু থাকতে হবে। অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপৎ এলাকা যেমন — তপঃজাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু অধ্যষিত এলাকা এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে কমপক্ষে ১০টি শিশু পাওয়া গেলেও ই.জি.এস. কেন্দ্র খোলা যাবে। (৫ থেকে ৯ বছর বয়সিদের জন্য প্রাথমিক এবং ৯+ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের জন্য উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়)।

তবে এই জাতীয় জনবসতি এলাকাগুলিতে যদি রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত **শিশু শিক্ষা কেন্দ্র** খোলা হয়ে থাকে এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যদি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুরা নথিভুক্ত হয়ে থাকে তবে ঐ একই এলাকায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

যে সমস্ত জনবসতি এলাকার ১ কিঃ মিঃ এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও নানা প্রাকৃতিক বাধার জন্য শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না সেই সমস্ত এলাকায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলা যাবে। (প্রাকৃতিক বাধাগুলি হল - নদী-নালা, খাল, ব্যস্ত বড় রাস্তা, পাহাড়, বন-জঙ্গল ইত্যাদি)

যে সমস্ত জনবসতি এলাকায় শিশুর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও কঠিন আর্থ-সামাজিক কারণে শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি, পারছে না বা ভর্তি হয়েও নানা কারণে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বা হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলা যাবে।

তবে এই জাতীয় সমস্যাবহুল এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য প্রথমে নানা প্রচারমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক কাজের উদ্যোগ আগে নিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে নানা প্রচেষ্টায় শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পরও যদি অবশিষ্ট ১৫টি শিশু ঐ এলাকায় বিদ্যালয় বহির্ভূত থেকে যায় তবে তাদের জন্য ই. জি. এস বিদ্যালয়ের প্রস্তাব নেওয়া যাবে। (অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ এলাকাগুলি হল - তপঃ জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। এইসব এলাকাগুলিতে ন্যূনতম ১০টি শিশু থাকলেও ই জি এস. কেন্দ্র খোলা যাবে।

ই জি এস বিদ্যালয় খোলার আগে গ্রাম সংসদ স্তরে তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা গ্রহণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি উপরিউক্ত সমস্যাবহুল এলাকায় ই জি এস বিদ্যালয় খোলার আগে প্রথমেই জেলাস্তরে সর্বশিক্ষা অভিযান ও ডি. পি. ই. পি. -র জেলা প্রকল্প আধিকারিক-এর সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবেন জেলা **প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিকল্পনা** অনুসারে জেলার কোন এলাকাটিতে বিদ্যালয়হীন জনবসতি বেশি কিংবা প্রাকৃতিক বাধার জন্য কোন এলাকার শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। কিংবা কোন এলাকায় বিদ্যালয় বহির্ভূত বা বিদ্যালয়ছুট শিশুর সংখ্যা বেশি। কিংবা শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা বেশি।

এই প্রাথমিক তথ্য জানার পর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সেই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে প্রারম্ভিক কথাবার্তা বলবেন। তারপর ঐ নির্দিষ্ট এলাকা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রারম্ভিক তথ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ / ওয়ার্ড স্তরের গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তারপর সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ / ওয়ার্ড এলাকায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের তথ্য সংগ্রহের কাজে নামবেন। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমেই **চাইল্ড রেজিস্টারের** সাহায্য নিতে হবে। চাইল্ড রেজিস্টার থেকে (পরিশিষ্ট ১ মোতাবেক) প্রাথমিক

তথ্য পাওয়ার পর সেগুলি বিশ্লেষণ করবেন। প্রয়োজনে পুনরায় গ্রাম সংসদ এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই তথ্যের নবীকরণ করবেন। তারপর চূড়ান্ত তথ্যের প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

চূড়ান্ত তথ্যের প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট-১) নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি গ্রাম সংসদ / ওয়ার্ড এলাকায় গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির নেতৃত্বে গ্রামবাসী / মহল্লাবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। এই মত বিনিময়ের সময় সম্ভাব্য সমস্যাগুলি — যেমন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু, শিশুশ্রমিক, বিদ্যালয় ছুট শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু ও কন্যা শিশুদের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে কী পরিকল্পনা করবেন তার প্রারম্ভিক আলোচনা করে নেবেন। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের কোনো অভিমত বা পরামর্শ থাকলে তা পরিকল্পনায় মর্যাদা দিতে হবে। মূল পরিকল্পনা করার আগে গ্রাম সংসদ / ওয়ার্ড স্তরে এইভাবে অনুপরিকল্পনার (Micro Planning) কাজ করতে হবে।

অণুপরিকল্পনা (Micro Planning) কীভাবে হয়েছে, কীভাবে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে কবে, কোথায় হয়েছে, কী পরামর্শ তারা দিয়েছেন ইত্যাদি বিষয়গুলি মূল পরিকল্পনার একটি অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তথ্যগুলি বিভিন্ন ছকে সাজিয়ে লিখতে হবে। (পরিশিষ্ট-২)। গ্রাম/ ওয়ার্ড স্তরে আলোচনা করে কতজন ছুটকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে তা উল্লেখ করতে হবে। (পরিশিষ্ট-৩)।

প্রতিটি গ্রামসংসদ / ওয়ার্ড এলাকার তথ্য পৃথকভাবে সাজাতে হবে। (পরিশিষ্ট - ১, ২ এবং ৩ মোতাবেক)।

প্রতিটি গ্রামসংসদ ও ওয়ার্ড এলাকার তথ্যগুলি সংকলন করতে হবে। (পরিশিষ্ট-৪ মোতাবেক)। অণুপরিকল্পনার ভিত্তিতে এলাকা ভিত্তিক সংগৃহীত পৃথক তথ্য নিয়ে (পরিশিষ্ট-১)। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি জেলা স্তরে প্রকল্প আধিকারিক-এর সঙ্গে বসে নিজেদের প্রকল্পের রূপরেখা প্রস্তুতকরণ নিয়ে আলোচনা করবেন যাতে জেলার মূল পরিকল্পনার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিকল্পনা, এলাকা ভাগ ও শিক্ষার্থীদের ভর্তিকরণ নিয়ে কোন সমস্যা বা overlaping না হয়। মনে রাখতে হবে যে জেলা প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিকল্পনা খাতে আমাদের যেটুকু আর্থিক সুযোগ আছে সেটাকে সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগেই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এইজন্যই পরিকল্পনার শুরু থেকেই জেলার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন।

কোথায় প্রকল্প জমা দেবেন এবং কীভাবে প্রকল্প অনুমোদিত হবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তুত করে জেলাস্তরে

জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান ও ডিপিইপি-র প্রকল্প আধিকারিকের নিকট জমা দেবেন।

প্রকল্প জমা দেবার সময় যে তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিতে হবে তা হল -

১. আবেদনপত্র - (নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক)
২. বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বিবরণ - (Annex - I)
৩. অনুস্তরীয় পরিকল্পনার প্রতিবেদন - (Annex - II)
৪. বিদ্যালয়ে ফেরৎযোগ্য শিশুর পৃথক তালিকা - (Annex - III)
৫. পৃথক গ্রাম সংসদ / ওয়ার্ড / বসতিভিত্তিক বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংকলিত তালিকা - (Annex - IV)
৬. গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি ও পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে চুক্তি পত্রের পৃথক কপি - (Annex - V & VI)
৭. প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত (বাজেট) তথ্য

জেলাস্তরে জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান কমিটি প্রকল্পের খুঁটিনাটি দিকগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন। তারপর তা অনুমোদন করে রাজ্যস্তরে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা-র** কাছে পাঠাবেন।

রাজ্যস্তরের **অনুদান মঞ্জুরি কমিটি** (Grant-In-Aid Committee) জেলাকর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবগুলি পুনরায় বিশ্লেষণ করবেন। প্রয়োজনে তাঁরা সরেজমিনে দেখবেন। তারপর অনুমোদন করবেন। তবে যদি নির্ধারিত বাজেট অতিক্রম করে প্রকল্প তৈরি হয় তবে তা রাজ্য প্রকল্প দপ্তর (GIAC) মতামত সহ অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে পাঠাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হওয়ার পর রাজ্য প্রকল্প দপ্তর জেলা প্রকল্প আধিকারিকের মারফৎ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে অর্থ বরাদ্দের জন্য নির্দেশ দেবেন এবং অনুমোদন প্রাপ্তির সংবাদ রাজ্য প্রকল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হবে।

কেন্দ্র পরিচালন ব্যবস্থা

একটি ই.জি.এস. কেন্দ্রের জন্য স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ২ জন। (প্রাথমিক স্তরের চারটি শ্রেণির জন্য)

স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নির্বাচনে গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির মতামতকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কিংবা বলা যেতে পারে গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে।

একটি কেন্দ্রের জন্য একটি শ্রেণিতে ৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী হলে আর একজন শিক্ষাসেবী নিয়োগ করা যাবে। তবে মোট শিক্ষাসেবী ২ জনের বেশি হবে

না।

শিক্ষাসেবীকে অবশ্যই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে। (প্রাথমিক স্তরের ই.জি.এস. কেন্দ্রের জন্য)। শিক্ষাসেবীর ন্যূনতম বয়স হবে ১৮ বছর। শিক্ষাসেবী নির্বাচনে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তবের জন্য (৫ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি) শিক্ষাসেবীকে অবশ্যই স্নাতক হতে হবে। এক্ষেত্রেও মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক এই উভয়স্তরের জন্য শিক্ষাসেবী নির্বাচনে স্থানীয় ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(যদি কোন এলাকায় স্থানীয় শিক্ষাসেবী না পাওয়া যায় তবে পার্শ্ববর্তী গ্রাম / মহল্লা থেকে শিক্ষাসেবী নির্বাচন করতে হবে।)

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক এই উভয় স্তরের জন্য যাঁরা শিক্ষাসেবী নির্বাচিত হবেন তাঁরা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত হবেন। চুক্তিটি হবে গ্রাম শিক্ষা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষাসেবীর মধ্যে। চুক্তিপত্রে এই তিন পক্ষই স্বাক্ষর করবেন। চুক্তি পত্রের নমুনা এখানে দেওয়া হল (পরিশিষ্ট - ৭)।

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক উভয় ক্ষেত্রেই চুক্তি হবে প্রাথমিক ভাবে এক বছরের। তবে চুক্তি ভঙ্গ করলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি যৌথ সিদ্ধান্ত করে তাঁকে যে কোনো সময়ে অপসারণ করে নতুন শিক্ষাসেবী (পূর্বে উল্লিখিত নিয়মে) নিয়োগ করবেন।

ই.জি.এস. (প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক) কেন্দ্র পরিচালনার জন্য গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিকে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংগঠকের ভুমিকা নেবেন। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত ও অন্যান্য উন্নয়ন বিভাগের সাহায্য - সহযোগিতা নিতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের জন্য শিক্ষাসেবীর প্রশিক্ষণ দিতে হবে মোট ৩০ দিন। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ হবে ১৬ দিনের। তারপর পরবর্তী ৭ মাস প্রতিমাসে ২ দিন করে প্রশিক্ষণ হবে। উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য মোট প্রশিক্ষণ হবে ৪০ দিন। প্রথম পর্যায়ে ২০ দিন। তারপর পরবর্তী ১০ মাস প্রতিমাসে ২ দিন করে।

স্বেচ্ছাসেবীদের সাম্মানিক দেবেন গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি / স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি স্বেচ্ছসেবীদের সাম্মানিক বাবদ টাকা চেক্ মারফৎ গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন।

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক উভয় কেন্দ্রেই প্রতিদিন কেন্দ্রটি ৪ ঘন্টা চলবে এবং সপ্তাহে ৫ দিন।

শিক্ষাসেবী প্রতিমাসে একটি কেন্দ্রভিত্তিক প্রতিবেদন গ্রাম / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির

সম্পাদক, সভাপতি ও তাঁর নিজের স্বাক্ষরসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মারফৎ জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান কমিটিকে জমা দেবেন। (পরিশিষ্ট - ৮)

সরকারি পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে প্রাথমিক স্তরের জন্য সরকারি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির জন্য প্রাপ্য হবে না।

উচ্চ-প্রাথমিকস্তরের জন্য সরকারি পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে এবং অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক এই উভয়কেন্দ্রগুলি তদারকির জন্য স্থানীয় কমিটি ছাড়া রাজ্য, জেলা, উপ-জেলাস্তরের (সি.এল.আর.সি., সি.আর.সি.) ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীগণ তদারকি করবেন।

ই.জি.এস কেন্দ্রে পাঠরত কোন শিশু প্রয়োজন মনে করলে যোগ্যতামানের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে।

এক নজরে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের জন্য ব্যয়ের ছক

ন্যূনতম ২০ জন শিক্ষার্থী ধরে (শিক্ষার্থী পিছু খরচ ১২০০ টাকা)

১.	স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের সাম্মানিক ১০০০ টাকা প্রতিজন, প্রতিমাসে (১০০০ × ১ জন × ১২ মাস) (সর্বোচ্চ - ২ জন)	-	১২,০০০=০০
২.	স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের প্রশিক্ষণ - ২ জন ২০০০ টাকা প্রতিজন (৪০ দিনের, প্রতিদিন ৫০ টাকা হিসাবে) (সর্বোচ্চ - ২ জন)	-	২,০০০=০০
৩.	শিক্ষার্থীর শিক্ষা উপকরণ প্রতি শিশু পিছু ১৫০ টাকা ২০ জন	-	৩,০০০=০০
৪.	কেন্দ্র পিছু শিক্ষা উপকরণ	-	১,২০০=০০
৫.	বিবিধ খরচ	-	৪০০=০০
		মোট -	১৮,৬০০=০০

- শিক্ষার্থীপিছু ব্যয় হল - ১৮৬০০ ÷ ২০ = ৯৩০=০০ টাকা
- শিক্ষার্থীপিছু গ্রন্থাগারের বই (পাঠ্য বই) ১০০ টাকা × ২০ = ২০০০=০০ টাকা
- তথ্য সংগ্রহ / অনুপরিকল্পনা গ্রামস্তরে সভা ইত্যাদি - ১,৪০০=০০
- ছাত্রছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা ৫০ টাকা হিসাবে × ২০ = ১০০০ টাকা
- বিদ্যালয়ের অন্যান্য উপকরনাদি, যেমন — শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা খাতা, সভার কার্য বিবরণী ও ফাইল ইত্যাদি ৫০০ টাকা (কেন্দ্র পিছু)
- শিক্ষণ শিখন উপকরণ ৫০০ টাকা (কেন্দ্র পিছু)

উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কতকগুলি মৌলিক বিষয় ঃ

- একটি শ্রেণিতে ন্যূনতম শিক্ষার্থী ২০ জন হলে একটি উচ্চ-প্রাথমিক কেন্দ্র খোলা যাবে
- প্রাথমিকভাবে একটি শ্রেণিতে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী হলেও ১ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক থাকবেন।
- একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় একই শ্রেণিতে ৪০-এর অধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকলে ২ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। তবে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ৪টি শ্রেণি হলেও ২ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকই থাকবেন।
- সরকারি অনুমোদিত বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যসূচি ব্যবহার হয় সেই পাঠ্যসূচিই ব্যবহার হবে।
- প্রতি বছর মে মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে।
- কোন বসতির ৩ ১/২ কি.মি.-র মধ্যে কোন বিদ্যালয় না থাকলে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তাব নেওয়া যাবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির জ্ঞাতার্থে মৌলিক বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা হল - কিন্তু উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাব গ্রহণের আগে রাজ্য প্রকল্প দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

প্রাথমিক স্তর

একটি কেন্দ্রের জন্য ব্যয়ের ছক
(কেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থী ধরে)
কেন্দ্রের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ধরন

১.	শিক্ষাসেবীর সাম্মানিক ১০০০ টাকা × ১২ মাস	-	১২,০০০=০০
২.	শিক্ষাসেবীর প্রশিক্ষণ ১৫০০ টাকা × ১ জন	-	১,৫০০=০০
৩.	কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ ১১০০ টাকা × ১টি	-	১,১০০=০০
৪.	শিক্ষার্থী পিছু শিক্ষা উপকরণ ১০০ টাকা × ২৫ জন	-	২,৫০০=০০
৫.	আনুষঙ্গিক ব্যয়	-	৪১০=০০
★৬.	কেন্দ্র পিছু উদ্ভাবনীমূলক কাজের বিশেষ খরচ		১০০=০০
		মোট -	১৭,৬০০=০০

- শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় - ১৭৬০০ ÷ ২৫ = ৭০৪ টাকা
- রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রশাসনিক ব্যয় ৫% = ৪২ টাকা
- কেন্দ্রের জন্য পরিচালন ব্যয় শিক্ষার্থী পিছু ৯৯ টাকা

সর্বমোট = ৮৪৫

বিঃদ্রঃ ★উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কাজের খরচ কেন্দ্র পিছু ১০০ টাকা রাজ্য প্রকল্প দপ্তর সরাসরি খরচ করবে

প্রকল্প পরিচালন ব্যয়ের ধরন (বাৎসরিক)

১. ২০টি কেন্দ্রের জন্য ১ জন সার্কেল রিসোর্স পার্সন (সি.আর.পি) - ১৫০০ টাকা হিসাবে

২. সি. আর. পি. প্রশিক্ষণ - ১০০০ টাকা হিসাবে

৩. সি আর. পি. -র ভ্রমণ ভাতা - ৩০০ টাকা (প্রতি মাসে)

৪. শিক্ষাসেবীদের নিয়ে সভা প্রতি মাসে - ৩০ টাকা হিসাবে (প্রতি শিক্ষাসেবী পিছু প্রতিমাসে)

৫. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জন্য পরিচালন ব্যয় - নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর যা পরবর্তী ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রশাসনিক ব্যয় - শতকরা ৫ টাকা হারে

প্রাথমিক স্তর
ন্যূনতম ২০টি কেন্দ্রের জন্য ব্যয়ের ছক
(গড়ে প্রতি কেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থী ধরে)

(ক) কেন্দ্রের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ধরন

১. শিক্ষাসেবীর সাম্মানিক (১০০০ টাকা × ২০ জন × ১২ মাস)	-	২,৪০,০০০=০০
২. শিক্ষাসেবীর প্রশিক্ষণ (১৫০০ টাকা × ২০ জন)	-	৩০,০০০=০০
৩. কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ (১১০০ টাকা × ২০টি কেন্দ্র)	-	২২,০০০=০০
৪. শিক্ষার্থী পিছু শিক্ষা উপকরণ (১০০ টাকা × ২৫ জন × ২০টি কেন্দ্র)		
৫. আনুষঙ্গিক ব্যয় (৪০০/- টাকা × ২০টি কেন্দ্র)	-	৮,০০০=০০
৬. উদ্ভাবনীমূলক কাজের বিশেষ খরচ (১০০ টাকা × ২০)	-	২,০০০=০০
মোট	-	৩,৫২,০০০=০০

(খ) প্রকল্প পরিচালন ব্যয়ের ধরন

১. একজন সি. আর. পি.র সাম্মানিক (১৫০০ টাকা × ১২ মাস)	-	১৮,০০০=০০
২. সি. আর. পি.-র ভ্রমণ ব্যয় (৩০০ টাকা × ১২ মাস)	-	৩,৬০০-০০
৩. সি. আর. পি.-র প্রশিক্ষণ (১০০০ টাকা × ১ জন)	-	১,০০০=০০
৪. শিক্ষাসেবীদের নিয়ে সভা (২০ জন × ৩০ টাকা × ১২টি কেন্দ্র)	-	৭,২০০=০০
৫. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জন্য পরিচালন ব্যয় (অনুপরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, সভা পরিচালনা, প্রচার, তদারকি ইত্যাদি)	-	১৯,২০০=০০
মোট	-	৪৯,০০০=০০
(ক + খ)		৪০১০০০-০০
৬. রাজ্য ও জেলার জন্য প্রশাসনিক ব্যয় (৫%)	-	২০,০৫০=০০
সর্বমোট	-	৪,২১,০৫০=০০

প্রাথমিক স্তর
৬০টি কেন্দ্রের জন্য
(কেন্দ্র পিছু গড়ে ২৫ জন শিক্ষার্থী ধরে)

(ক) কেন্দ্রের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ধরন

১. শিক্ষাসেবীর সাম্মানিক (৬০ জন × ১০০০ টাকা × ১২ মাস)	-	৭,২০,০০০=০০
২. শিক্ষাসেবীর প্রশিক্ষণ (৬০ জন × ১৫০০ টাকা)	-	৯০,০০০=০০

৩.	কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ (১১০০ টাকা × ৬০টি)	-	৬৬,০০০=০০
৪.	শিক্ষার্থী জন্য শিক্ষা উপকরণ (২৫ জন × ১০০ টাকা × ৬০টি)	-	১,৫০,০০০=০০
৫.	কেন্দ্র পিছু আনুষঙ্গিক ব্যয় (৪০০ টাকা × ৬০টি)	-	২৪,০০০=০০
৬.	কেন্দ্র পিছু উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ খরচ (১০০ টাকা × ৬০)	-	৬,০০০=০০
	মোট	-	১০,৫৬,০০০=০০

(খ) প্রকল্প পরিচালন ব্যয়ের ধরন

১.	৩ জন সি. আর. পি. -র সাম্মানিক (১৫০০ × ৩ জন × ১২ মাস)	-	৫৪,০০০=০০
২.	সি. আর. পি. -র ভ্রমণ ব্যয় (৩০০ টাকা × ৩ জন × ১২ মাস)	-	১০,৮০০=০০
৩.	শিক্ষাসেবীদের মাসিক সভা (৩০ টাকা × ৬০ জন × ১২ মাস)	-	২১,৬০০=০০
৪.	সি. আর. পি. -র প্রশিক্ষণ (১০০০ টাকা × ৩ জন)	-	৩,০০০=০০
৫.	অফিস সহায়ক ১৫০০ × ১২ মাস	-	১৮,০০০=০০
৬.	অণুপরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, টাইপিং, সভাসমিতি, ভ্রমণ খরচ, টিফিন ইত্যাদি বাবদ ১৫০০ টাকা × ১২ মাস	-	১৮,০০০=০০
৭.	প্রচার, শিশুদের জন্য প্রতিযোগিতা, মেলা ইত্যাদি ১০০০ টাকা × ১২ মাস	-	১২,০০০=০০

৮. সাইকেল মেসেনজার / পিওন ১০০০ টাকা × ১২ মাস	-	১২,০০০=০০
মোট	-	১,৪৯,৪০০=০০
(ক + খ)		১২,০৫,৪০০=০০
৯. রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রশাসনিক ব্যয় মোট অর্থের ৫%)	-	৬০,২৭০=০০
সর্বমোট	-	১২,৬৫,৬৭০=০০

প্রাথমিক স্তর

।। ১০০টি কেন্দ্রের জন্য ব্যয়ের ছক ।।

(কেন্দ্র পিছু গড়ে ২৫ জন শিশু ধরে)

(ক) কেন্দ্রের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ধরন

১. শিক্ষাসেবীর সাম্মানিক (১০০০ টাকা × ১০০ জন × ১২ মাস)	-	১২,০০,০০০=০০
২. শিক্ষাসেবীর প্রশিক্ষণ (১৫০০ টাকা × ১০০ জন)	-	১,৫০,০০০=০০
৩. কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা উপকরণ (১১০০ টাকা × ১০০টি)	-	১,১০,০০০=০০
৪. শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপকরণ (১০০ টাকা × ১০০ কেন্দ্র × ২৫ জন)	-	২,৫০,০০০=০০
৫. আনুষঙ্গিক ব্যয় (১০০ কেন্দ্র × ৪০০ টাকা)	-	৪০,০০০=০০
*৬. কেন্দ্রপিছু উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ খরচ (১০০ টাকা × ১০০)	-	১০,০০০=০০
মোট	-	১৭,৬০,০০০=০০

(খ) প্রকল্প পরিচালন ব্যয়ের ধরন

১. ৫ জন সি. আর. পি.-র সাম্মানিক (১৫০০ টাকা × ৫ জন × ১২ মাস)	-	৯০,০০০=০০
২. সি. আর. পি.-র ভ্রমণ ব্যয় (৩০০ টাকা × ৫ জন × ১২ মাস)	-	১৮,০০০=০০
৩. শিক্ষাসেবীদের মাসিক সভা (৩০ টাকা × ১০০ জন × ১২ মাস)	-	৩৬,০০০=০০
৪. সি. আর. পি.-র প্রশিক্ষণ (১০০০ টাকা × ৫ জন)	-	৫,০০০=০০
৫. অফিস সহায়ক ১ জন (২০০০ টাকা × ১২ মাস)	-	২৪,০০০=০০
৬. অণুপরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, টাইপিং, সভাপরিচালনা, যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি (৩০০০ টাকা × ১২ মাস)	-	৩৬,০০০=০০
৭. প্রচার, প্রতিযোগিতা, মেলা (১৫০০ টাকা × ১২ মাস	-	১৮,০০০=০০
৮. সাইকেল মেসেনজার (১৫০০ টাকা × ১২ মাস)	-	১৮,০০০=০০
মোট	-	২,৪৫,০০০=০০
(ক + খ)		২০,০৫,০০০=০০
৯. রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রশাসনিক ব্যয় (৫%)	-	১,০০,২৫০=০০
সর্বমোট	-	২১,০৫,২৫০=০০

পুস্তক সমালোচনা

প্রতিদিনের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

লেখক ঃ শক্তি মণ্ডল

প্রকাশক ঃ সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি

মূল্য ঃ ২১ টাকা

"আমাদের জীবনে প্রতিদিন কত কী ঘটে চলেছে। 'এ সব তো এরকমই হয়'—এই মনোভাবের জায়গায় প্রতিটি ঘটনা কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা দরকার।"

শ্রী শক্তি মণ্ডলের "প্রতিদিনের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা" বই-এর সূচনায় সুলেখক ও সুসমালোচক শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী স্বল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই বইটির গুরুত্ব কত গভীর।

শ্রী মণ্ডল আমাদের জিজ্ঞাসুমনের নানান প্রশ্ন এই বইতে চব্বিশটি আশেপাশের ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন - যা আমরা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করি অথচ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনা বা ভেবে দেখারও চেষ্টা করিনা।

যেমন - 'আমাদের খিদে বা ঘুম পায় কেন?' দুটোই অহরহ শরীরে বহমান অথচ আমরা ভাবিনা কেন এমন হয়। হয়তো ভাবি হতে হয় বলে। আমাদের খাবার সাথে সাথে পাকস্থলী সক্রিয় হয়ে হজমি রস বার করতে থাকে। মোটামুটি চার থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে খাবারটা হজম হয়ে গেলে খিদের অনুভুতি তীব্র হয়। মাথার অনুভূতি-কেন্দ্র জানান দেয় এবার খেতে হবে। তাই আমরা খাদ্যগ্রহণ করি। তেমনি ঘুমের বেলায় শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তিতে মাথায় স্নায়ুজান সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে। তখন স্নায়ুগুলি (নার্ভ) আর খবর দেওয়া নেওয়া করে না - তাকেই আমরা ঘুম বলি। নির্দিষ্ট সময় ঘুমিয়ে নিলেই শরীর আবার কর্মক্ষম হয়ে পড়ে।

তেমনি মাথার চুল পাকে কেন? চুলের গোড়ার শেযে মেলানিন নামক রজক পদার্থের দরুণ চুল কালো দেখায়। আবার মেলানিনের পরিমাণ নির্ভর করে এক

ধরনের হরমোনের উপর। বয়স হলে কোষগুলি কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে চুলের রং সাদা হতে থাকে। অসময়ে চুল পাকার কারণ হল ঐ হরমোনের কম নিঃসরণ হওয়া।

একই রকম দুধের মধ্যে অল্প দই দিলে সবটা দই হওয়াব কারণ হল — দই-এর মধ্যে থাকে ল্যাকটোব্যাসিলাম নামক জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া। এরা দুধ এর মধ্যে দ্রুত বংশ বিস্তার করে এবং দুধকে দইতে পরিণত করে।

জলাভূমিতে আমরা যে আলো দেখি — তাকে বলা হয় আলেয়ার আলো। এটা আর কিছুই নয় — আবর্জনা, পাঁক, আগাছা পচে পচে এক ধরনের গ্যাস তৈরি হয়। তার নাম মিথেন। এই আলোর সাথে ভৌতিক আলোর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে ভৌতিক আলো বলে কিছু নেই। ওটা মানুষের কল্পনাপ্রসুত অবৈজ্ঞানিক ধারণা।

এক কথায় বইটি অনবদ্য। জানা থেকে অজানা আবার ভুলে যাওয়া বহু কাহিনিই আবার মনে করিয়ে দেয় - বাস্তব সত্যটাকে। তাই এই বই-এর বিষয়বস্তু কোনো কাল বা বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সকল বয়সের মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে বিজ্ঞান চেতনা।

শ্রী মণ্ডলের কাছ থেকে এ রকম বহু বলিষ্ঠ লেখার প্রত্যাশা রইল।

হেমেন মৈত্র

এ দেশের প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক মানুষের মত এই যে নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকবে না। ঠিক ইহার বিপরীত কথা সত্য। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।

শিবনাথ শাস্ত্রী

বর্ধমান জেলার আমজারুলিয়া—সাক্ষরতার মাধ্যমে সার্বিক পরিবর্তনের অনন্য নজির

দিলীপ কুমার দে*

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে গণ-সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম হল বর্ধমান জেলা। ১৯৯০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে, এই জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের সূচনা হয়। প্রায় ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবী ৪১ হাজার সাক্ষরতা কেন্দ্রে, অবহেলিত গ্রাম-গঞ্জ-বস্তিতে নিরলসভাবে শিক্ষার কাজ চালিয়ে যান। সাক্ষরতার কাজে ভারতের দ্বিতীয় সফল জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয় এই জেলা।

সাক্ষরতা অভিযানের পর রাজ্যের মধ্যে এই জেলাতেই সর্বপ্রথম চালু হয় সাক্ষরোত্তর অভিযান। তখনও জাতীয় স্তরে এর কোনও রূপরেখা স্থির হয়নি। প্রয়াত শিক্ষাবিদ এবং আমাদের অতিপ্রিয় সত্যেনদার পরামর্শেই জেলাতে এই অভিযান সংগঠিত হয়। এরপর চলে 'জনশিক্ষণ নিলয়ম' কার্যক্রম। এটিও এক ধরণের প্রবহমান শিক্ষা কার্যক্রম। এরপরে জাতীয় স্তরে রূপরেখা তৈরি হবার পর চালু হয় বর্তমান পর্যায়ের ধারাবাহিক বা প্রবহমান শিক্ষা (Continuing Education) কার্যক্রম।

> আমাদের দেশে গণ-সাক্ষরতার এক ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকে। এখন তা উন্নীত হয়েছে জনশিক্ষা আন্দোলনে। নানা সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা মিলিয়েই এই আন্দোলন। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদ-মাধ্যমে এই আন্দোলনের বাস্তব বা কল্পিত ত্রুটিগুলিকেই তুলে ধরা হয়। সাফল্যের দিকগুলিকে তুলে ধরা হয় না। আমরা পত্রিকার এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে চাই। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবনিষ্ঠ সচিত্র প্রতিবেদন পাঠাতে অনুরোধ করছি।
>
> -সম্পাদকমণ্ডলী

এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও রাজ্যের মধ্যে সবদিক থেকে এগিয়ে থেকেছে এই জেলা। সূর্যগ্রহণের সময় বিজ্ঞানচেতনা বিকাশ, আদিবাসী মেয়েদের জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষণ, নিজস্ব উদ্যোগে সমমান শিক্ষা কর্মসূচি প্রভৃতি এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বর্তমানে নানা কারণে জেলাটি এই কার্যক্রম রূপায়ণে কিছুটা

**শ্রী দিলীপ কুমার দে একজন প্রবীণ সাক্ষরতা কর্মী এবং বর্তমানে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি পরিচালিত জেলা সম্পদ কেন্দ্রের সঞ্চালক।*



একজন নব সাক্ষরের হাতে বই তুলে দিয়ে ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা করছেন জননেতা বিনয় চৌধুরী।



১৯৯১ সালে বর্ধমানের একটি অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা সাক্ষরোত্তর কার্যক্রম (স্তর ১)-এর উদ্বোধন করছেন।



তৎকালীন জনশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জু কর ধারাবাহিক শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকজন বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

সমস্যার মধ্যে পড়লেও, জেলার নানা এলাকায় বেশ কিছু ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র বা জনশিক্ষা কেন্দ্র (CEC) চলছে স্থানীয় উদ্যোগে। এই সব কেন্দ্রের মধ্যে অবশ্যই আমজারুলিয়ার কেন্দ্রগুলি অনন্য দৃষ্টান্ত। রাজ্যের জনশিক্ষা কর্মীদের কাছে আমজারুলিয়ার কাহিনি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমজারুলিয়া জঙ্গলমহল এলাকার অরণ্যে ঘেরা একটি পুরোপুরি আদিবাসী গ্রাম। বর্ধমান জেলার সদর উত্তর মহকুমার আউশগ্রাম - ২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এই গ্রামটি।

সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের পূর্বে এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস,

কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হত। কিন্তু সার্বিক সাক্ষরতা শুরু হবার পর ১৯৯১ সালের বহির্মূল্যায়নে দেখা গেল যে ঐ গ্রামে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা অনেকটাই ধুয়ে মুছে গেছে।

এই এলাকার ১৪০ হেক্টরেরও বেশি জমি অরণ্যে ঘেরা। এই গ্রামের প্রবেশ পথে বিস্তীর্ণ এলাকা গহন অরণ্য। সোনাঝুরি, শাল, মহুয়া, পলাশ, শিমূল শিরীষ ঘেরা এই বনাঞ্চল।

বনরক্ষা কমিটি, বনবিভাগ ও পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে এই বিশাল অরণ্য রক্ষিত হয়, কারণ বসতির অধিবাসীদের জীবন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই অরণ্য সম্পদ।

এই গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি, মহিলা কল্যাণ সমিতি ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২০০১ সালে ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়। এই ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের পাশেই তৈরি হয়েছে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ধানের গোলা।

এখানে, বর্তমানে ৬৭টি পরিবারের বাস। এরা সবাই আদিবাসী। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। এলাকায় কোনও শিশু বা বালক বালিকা শিক্ষার আঙিনার বাইরে নেই।

সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের সব থেকে বড় নিদর্শন বিদ্যালয়ের বাইরে কোনও শিশু না থাকা। গ্রামের প্রতিটি বয়স্ক পুরুষ ও নারী আজ নব-সাক্ষর ও স্ব-নির্ভর সাক্ষর। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের ফলে শিশুদের ও বালক বালিকাদের অভিভাবকেরা সাক্ষর হয়েছিলেন বলেই নানা বিষয়ে সচেতন হয়ে ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে শৌচাগার প্রকল্প এই গ্রামে সম্পূর্ণ সফল। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই এখন শৌচাগার ব্যবহার করেন।

এখানকার ধারাবাহিক শিক্ষা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রেরক, সহ-প্রেরক, মুখ্য প্রেরক, ব্লক-সমন্বয়কারী, জেলা-পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েতের সদস্য ও বিভাগীয় আধিকারিকদের উদ্যোগে এই গ্রামটি এখন আর্থ সামাজিক দিক থেকেও অনেক উন্নত হয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা জেলা ও রাজ্যস্তরের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

এখানকার বয়স্কা মহিলা, এমনকি বালিকারাও সাক্ষরতার সপক্ষে, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে, শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও চাষবাসের উপর নিজেরাই গান রচনা করেন। রাতের দিকে ধামসা, মাদল, ও বাঁশির তালে তালে বসে নাচ ও গানের আসর।

এখন পর্যন্ত আমজারুলিয়া ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্যোগে সাতটি স্বয়ম্ভর

গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিতে মহিলা সদস্যই বেশি। এই এলাকার পাঁচটি বড় পুকুরে মাছ চাষ হয়। পুকুর পাড় ঘিরে কলা, পেঁপের চাষ এবং মুরগি ও খরগোশ পালন করা হয়। এসব থেকে যে আয় হয় সেই টাকার থেকে ব্যাংকের ঋণ শোধ করেও যে বাড়তি টাকা থাকে, তা দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সরকারি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এস, আর, সি-র থেকেও এদের একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিতে নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই গোষ্ঠীগুলিতে কেউই নিরক্ষর নন। কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা (গোষ্ঠীর সদস্যসহ) সমমান শিক্ষার মূল্যায়নে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৯-১৩ বছরের বিদ্যালয়-ছুট পড়ুয়ারাও সমমান শিক্ষার ফলে নিকটবর্তী হাইস্কুলে পড়াশোনা করছে। এলাকার নিকটবর্তী গেড়াদুয়ে, বর্ধমান গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেনে পুষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচি বর্ধমানে শুরু হয়েছে ২০০০ সালে।

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলার অন্যান্য এলাকার মতো এই গ্রামেও 'মা ও মেয়ে মেলা', 'মাতৃ সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। মাঝে মাঝেই এক একটি বিষয় ধরে করা হয় আলোচনা।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে মাতা শিক্ষক সমিতি আছে, তাদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের ঝুপড়ি ও বস্তি এলাকায় অনেক মায়েরাই নিরক্ষর। মাতা শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হয়ে নিরক্ষর মা শিক্ষার গুণগত মান ও পরিকাঠমোর উন্নয়ন সম্বন্ধে কতটুকু বুঝতে পারবেন?

আমজারুলিয়া গ্রামের প্রতিটি শিশুর অভিভাকক স্ব-নির্ভর সাক্ষর। সেইজন্য এই গ্রামের শিশুদের ও বালক বালিকাদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মূল্যায়ন করার কাম্য সামর্থ্য তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

সাক্ষরতা, সচেতনতা ও সক্ষমতায় অনেকাংশে উত্তীর্ণ আমজারুলিয়া গ্রাম গ্রামবাংলার প্রতিটি পিছিয়ে পড়া গ্রামের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রেরণা সৃষ্টি করবে, এই আশাকরি।

মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস

পাওলো ফ্রেইরি

[*অনুবাদ* : পাহাড়ী চৌধুরী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐতিহাসিক প্রভাব ও চেতনার স্তর

চেতনার স্তরগুলিকে বুঝতে হলে সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অবশ্যই একটি পরিকাঠামোর উপরিকাঠামো হিসেবে বিচার করতে হবে। চেতনার স্তর সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সংবেদনশীল। তাই আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে চেতনার স্তরের প্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা করব।

চেতনার সূত্রপাত এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে গবেষণার চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা ল্যাটিন আমেরিকার বাস্তব পটভূমিকায় সুনির্দিষ্টভাবে চেতনার স্তরগুলির প্রাথমিক বিশ্লেষণ করতে চাই। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও প্রধান শহরগুলির যে সব অঞ্চল নীরবতার এলাকা হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের অঙ্গীভূত সেখানেও এই বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমে, যাকে আমরা নীরবতার সংস্কৃাত বলি, সেই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অবস্থাটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। সংস্কৃতির এই ধারাটি হল এমন এক উপরিকাঠামোগত অভিব্যক্তি যা এক বিশেষ ধরনের চেতনার উদ্ভব ঘটায়। যে পরিকাঠামোর মধ্যে নীরবতার সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়, সেই পরিকাঠামো এর দ্বারা বড়ো বেশি রকম নিয়ন্ত্রিত হয়। অ্যালথুসার এটা দেখিয়েছেন।

নীরবতার সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে, একে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। এই সামগ্রিকতা হল বৃহত্তর এক সামগ্রিকতার অংশ বিশেষ। এর মধ্যে অবশ্যই আমরা সংস্কৃতরি চর্চাকে স্থান দেব। এই সংস্কৃতির চর্চাই নীরবতার সংস্কৃতির কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা মনে করি না যে এই নীরবতার সংস্কৃতি হল এমন একটা কিছু যা বড়ো বড়ো শহরের বিশেষভাবে তৈরি গবেষণাগারে তৈরি করে তৃতীয় বিশ্বে চালান করা হয়। অবশ্য, একথাও ঠিক যে এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করে না। আসলে, তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে বড়ো বড়ো শহরগুলির সম্পর্কের মধ্যেই নীরবতার সংস্কৃতি জন্ম নেয়। শাসক শ্রেণি কোনো সংস্কৃতি সৃষ্টি করে তা

শাসিতদের ওপরে চাপিয়ে দেয় না। এই সংস্কৃতি হল শাসককূল এবং শাসিতদের মধ্যে অবস্থানগত সম্পর্কের ফলশ্রুতি।[১১] তাই নীরবতার সংস্কৃতিকে বোঝার অন্যতম পূর্ব শর্ত হল, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নির্ভরশীলতার বিশ্লেষণ। যারা নীরবতার সংস্কৃতির শিকার আর যাদের মত প্রকাশের অধিকার আছে এই দু-ধরনের মানুষের মধ্যে থাকা, চিন্তা করা, ভাব প্রকাশ করা, সব বিষয়ে যে পার্থক্য গড়ে ওঠে তার ভিত্তি হল এই নির্ভরশীলতা।

এই নিবন্ধে ইতিপূর্বে আমরা দুটি অবস্থানের সমালোচনা করেছি। এদের প্রথমটি হল বস্তুবাদ। যা মানুষকে যান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে যায়। আর দ্বিতীয়টি হল ভাববাদ। যা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যায়। এই দুটি অবস্থানকেই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়াও, উপরিকাঠামোকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া এবং পরিকাঠামো থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি আমরা উপরিকাঠামো বা পরিকাঠামোর যে কোনোটিকে লঘু করে দেখি তবে সামাজিক গঠনকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সামাজিক গঠন কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। উপরিকাঠামো এবং পরিকাঠামোর দ্বন্দ্বের মধ্যেই এর অবস্থান। এই দ্বন্দ্বকে না বুঝলে, আমরা, সামাজিক গঠনের অভিব্যক্তি হিসেবে, পরিবর্তনশীলতা এবং স্থায়িত্বের দ্বন্দ্বকে বুঝতে পারব না।

মানুষের কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবর্তনের ধারার মধ্যেই পরিকাঠামোর জন্ম। এটা ঠিক, যে এই পরিকাঠামোর ওপরেই গড়ে উঠেছে উপরিকাঠামো। কিন্তু, এটাও ঠিক, যে উপরিকাঠামো পরিকাঠামোর ঘাড়ে চেপে বসে তাকে বড়ো বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষই এতে সহায়তা করে। এর গুণকীর্তন করে। এই ভঙ্গুর সম্পর্কগুলির পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই মানুষ পৃথিবীতে টিকে আছে। কাজ করছে। এই পরিবর্তনশীলতা আছে বলেই আমরা সামাজিক গঠনের কথা বলতে পারছি। বলতে পারছি মানুষের কথা। মানবিক পৃথিবীর কথা।

এবার নগর সমাজ ও পরাশ্রয়ী সমাজের মধ্যে সম্পর্কের কথায় ফিরে আসা যাক। এই দুই সমাজের থাকা, চিন্তা করা, ভাব প্রকাশ করার ভঙ্গি আলাদা আলাদা। এই পার্থক্যের উৎস হিসেবে আমাদের এই সম্পর্ককে দেখতে হবে। নগর সমাজ এবং পরাশ্রয়ী সমাজ উভয়েই নিজের বৃত্তের মধ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই এক বৃহত্তর সামগ্রিক সমাজের অংশ। যার অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধাপে ধাপে বিকশিত হয়।

---

[১১] জোসি লুই ফিয়োরি লেখককে একটি চিঠিতে একথা জানিয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বে এই ধরনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, আইসি আই আর এ -এর চিলির জন্যে গঠিত দলে, জোসি, লেখকের অন্যতম সহকারী ছিলেন।

একই প্রেক্ষিতে এই সমাজগুলির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবু, এই সম্পর্কের গুণমান, অবশ্যই, প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে কার কী ভূমিকা, তার ওপরে এই গুণমান নির্ভর করে। পরাশ্রয়ী সমাজের ওপরে নগর সমাজের প্রতিক্রিয়ার একটা নির্দেশাত্মক চরিত্র থাকে। পক্ষান্তরে, পরাশ্রয়ী সমাজের ক্রিয়া, তা প্রতিক্রিয়াই হোক বা প্রাথমিক উদ্যোগই হোক, তার চরিত্র হল পর-নির্ভর।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রতিফলন দেখা যায় শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে যদি সেই সম্পর্ক ব্যক্তিগত হয়, তবুও। শাসিতদের পক্ষে, এই ধরনের সম্পর্কের অর্থ হল শাসকশ্রেণির সংস্কৃতিকে গলাধঃকরণ। পরাশ্রয়ী সমাজের ওপরে নগর সমাজের প্রভাব পড়ে। এইভাবে নগর সমাজের মূল্যবোধ ও জীবনধারার অনুপ্রবেশ ঘটে পরাশ্রয়ী সমাজে। এর ফলে পরাশ্রয়ী সমাজে প্রকট হয়ে ওঠে দ্বিচারিতা, অস্পষ্টতা, থাকা না থাকার দ্বন্দ্ব এবং দীর্ঘকালীন পরনির্ভরতার যা বৈশিষ্ট্য সেই দোদুল্যমানতা। নগর সমাজ এদের আকর্ষণ করে। আবার তাকে এরা মেনে নিতেও পারে না।

পরাশ্রয়ী সমাজের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে, শাসক সমাজের মর্জিমাফিক। ফলে যে উপরিকাঠামো তৈরি হয় তাতে পরিকাঠামোর এই কৃত্রিমতার ছাপ পড়ে। অর্থনৈতিক বিন্যাসের কলাকৌশল এবং অত্যুন্নত প্রযুক্তি দিয়ে শহরাঞ্চল তার আদর্শের সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু পরাশ্রয়ী সমাজের সে ক্ষমতা নেই। তাই প্রায়শই পরাশ্রয়ী সমাজ অনড় হয়ে থাকে।

অভিধা অনুযায়ী পরাশ্রয়ী সমাজ হল নীরব সমাজ। এ যা বলে তা এর নিজের কথা নয়। শহরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। সবদিক থেকেই শহর কথা বলে। পরাশ্রয়ী সমাজ শুধু শোনে।[১২]

শাসক সমাজ সম্বন্ধে শাসিত সমাজের যে নীরবতা, তার পুনরাবৃত্তি ঘটে শাসিত সমাজের নিজের মধ্যেও। এর ক্ষমতাধর কেষ্টবিষ্টুরা শাসক শ্রেণির কাছে নিজেরা মুখ খুলতে পারে না। আবার নিজেদের সমাজেও এরা মানুষকে কথা বলতে দেয় না। শুধু যখন শাসিত সমাজের মানুষ নীরবতার সংস্কৃতিকে ভেঙে খানখান করে দেয়—নিজেদের কথা বলার অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়—অর্থাৎ যখন পরিকাঠামোর

[১২]গির্জার ক্ষেত্রে যেটা ঘটে তা লক্ষ করার মতো। 'মিশনের এলাকা' ধারণাটির সূত্রপাত শহরাঞ্চলে। 'মিশনের এলাকা' থাকতে হলে তার বাইরেও কিছু থাকতে হবে। যার ফলে 'মিশনের এলাকা' নামটা হয়েছে। মিশন যারা পাঠায় তাদের সঙ্গে শহরাঞ্চলের একটা তাৎপর্যবাহী সাদৃশ্য রয়েছে। তেমনি সাদৃশ্য রয়েছে মিশনের এলাকা আর তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে। অথচ, আমাদের মনে হয়, খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সব দেশই মিশনের এলাকা।

আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শাসিত সমাজের রূপ বদলায়—কেবল তখনই শাসিত সমাজ সামগ্রিকভাবে শাসক সমাজকে আর মুখ বুজে মেনে নেয় না।

অন্যদিকে, যদি একদল মানুষ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং জাতীয় স্বার্থবাহী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা শুরু করে, তবে তার ফলে নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিককালে পেরুতে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। এই সংকটের ফলে নীচে লেখা পরিস্থিতিগুলির যে কোনোটির উদ্ভব হতে পারে। প্রথমত নতুন ব্যবস্থায় কিছু বাড়াবাড়ি হতে পারে। এতে ঘরে-বাইরে উভয়তই শেষ পর্যন্ত 'নীরবতার সংস্কৃতি' নিশ্চিতভাবে বিদায় নিতে পারে। অথবা জনগণের উত্থানে ভয় পেয়ে নতুন প্রশাসন পিছিয়ে আসতে পারে এবং আবার জনগণের কণ্ঠরোধ করতে পারে। তৃতীয়ত, সরকার নতুন ধরনের জনমোহিনী নীতি গ্রহণ করতে পারে। তখন জাতীয়তাবাদী প্রাথমিক পদক্ষেপগুলির ফলে দলিত জনগণ অনুপ্রাণিত হয়। মোহগ্রস্ত হয়ে তারা ভাবতে শুরু করে যে সমাজ বদলের প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করছে। আসলে কিন্তু সুকৌশলে তাদের ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৮ সালে পেরুতে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখন করে। তারা যখন তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন তাদের অনেক কাজে পেরুর সমাজের একান্ত রক্ষণশীল অংশের মধ্যেও অনৈক্য দেখা দেয়। এই অনৈক্যের সূত্র ধরেই তারা নীরবতার সংস্কৃতির কবল থেকে বেরিয়ে আসে। উত্তরোত্তর তাদের চাহিদা বাড়তে থাকে। যতক্ষণ তাদের চাহিদা পূরণ হয় ততক্ষণ শুধু যে চাহিদা বেড়ে চলে তাই নয়, চাহিদার চরিত্রও বদলায়।

এইভাবে শাসকগোষ্ঠীর সামনে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করে জনমোহিনী নীতির শেষ হয়। তখন হয় তা নীরবতার সংস্কৃতিকে বরাবরের মতো ভেঙে ফেলে নয়তো আবার তা চালু করতে বাধ্য হয়। তাই আমাদের মনে হয়, ল্যাটিন আমেরিকার বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে কোনো সরকারের পক্ষেই অভ্যন্তরীণ নীরবতার সংস্কৃতি বজায় রেখে শহরাঞ্চল সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে আক্রমণাত্মক স্বতন্ত্র নীতি নিয়ে চলা সত্যিই কঠিন।

১৯৬১ সালে, ব্রাজিলে, জেনিয়ো কোয়াদ্রস ক্ষমতাসীন হন। জাতির ইতিহাসে সম্ভবত এটাই ছিল বৃহত্তম নির্বাচনী জয়। তিনি শহরাঞ্চলের স্বাধীনতা এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের এক দুমুখো নীতি নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন। সাত মাস ক্ষমতাসীন থাকার পরে, অপ্রত্যাশিতভাবে, তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, অদৃশ্য কোনো এক শক্তির চাপে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এবং এই অদৃশ্য শক্তিই রাষ্ট্রপতি গেটুলিয়ো ভার্গাসকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল। করুণভাবে বিদায় নিয়ে তিনি লন্ডনের পথে

যাত্রা করেন।

ব্রাজিলের সামরিক গোষ্ঠী, ১৯৬৪ সালে, গোলার্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। তারা একটি সুসম্বদ্ধ নীতি নিয়েই এগিয়েছিল। আমাদের আগের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, তাদের নীতি ছিল শহরাঞ্চলকে তোল্লা দেওয়া এবং নিজেদের লোকেদের ওপর কঠোর নীরবতা আরোপ করা। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নীরবতার অবসান ঘটানো এবং শহরাঞ্চলকে তোল্লা দেওয়া বাস্তবে সম্ভবপর ছিল না। অভ্যন্তরীণ নীরবতা বজায় রেখে শহরাঞ্চলকে নিজের মতো চলতে দেওয়ার নীতি সফল হয়নি।

স্পেনীয় এবং পর্তুগিজদের অভিযানের সময় থেকেই ল্যাটিন আমেরিকার সমাজগুলি বদ্ধসমাজে পরিণত হয়। তখন থেকেই গড়ে ওঠে নীরবতার সংস্কৃতি। আজও এগুলি বদ্ধসমাজ হয়েই রয়ে গেছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল বিপ্লবোত্তর কিউবার সমাজ।[১৩] এই বদ্ধ সমাজগুলি সব সময়েই পরাধীন। শুধু কারা তাদের শাসন করবে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে, বদলে গেছে সেটাই। কখনো পর্তুগাল, কখনো স্পেন, কখনো ইংল্যান্ড, কখনো বা যুক্তরাষ্ট্র।

ল্যাটিন আমেরিকার, সমাজগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বগুলির জন্যেই এগুলি বদ্ধসমাজ হয়ে রয়েছে। এদের সামাজিক গঠন কঠোরভাবে শ্রেণি-বিভক্ত। যেহেতু এদের অর্থনীতি বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই এদের কোনো অভ্যন্তরীণ বাজার নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা শোচনীয়। মুষ্টিমেয় মানুষই শিক্ষা পায়। বিদ্যালয়গুলি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যন্ত্রবিশেষ। নিরক্ষরতা এবং রোগভোগের হার অত্যন্ত বেশি। কিছু রোগকে অবুঝের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোগ বলা হয়। আসলে এগুলি হল অনুন্নত অঞ্চলের রোগ। পরাধীনতার রোগ। এদের শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ। এরা অপুষ্টির শিকার। এরা অসহনীয় মানসিক চাপ ভোগ করে। এরা স্বল্পায়ু, এদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেশি।

এই ধরনের পরাধীন সমাজে সুনির্দিষ্ট বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সচেতনতার একটি ধারা আছে। এই সচেতনতা সমাজের গঠনের ধারা দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সচেতনতা যে সমাজের গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেই সমাজের মতোই পরাধীন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বস্তুগত বাস্তবের প্রতি আধা-আনুগত্য বা বাস্তব অবস্থায় আধডোবা হয়ে থাকা।[১৪] আমি Pedagogy of the Oppressed

[১৩]'বদ্ধ সমাজ' সম্বন্ধে হেনরি বার্গসন-এর The Two Sources of Morality and Religion (নৈতিকতা ও ধর্মের দুটি উৎস) এবং কার্ল পপার-এর The Open Society and Its Enemies (মুক্ত সমাজ ও তার শত্রুরা) বইদুটি দেখুন।

[১৪]ল্যাটিন আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে এই ধারার সচেতনতা আজও আখচার দেখা যায়। সেখানে বড়ো বড়ো জোতদাররা (Latifundios)-ই হল আইন। গড়ে উঠেছে বদ্ধ সমাজ। নীরবতার সংস্কৃতি সেখানে অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

(নিপীড়িতের শিক্ষাদর্শন)-এ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছি যে পরাধীন সচেতনতা বাস্তব থেকে যথেষ্ট দূরত্ব অর্জন করতে পারে না। তাই একে বস্তুজ্ঞানে বিশ্লেষণ করতেও পারে না। সচেতনতার এই ধারাটিকে তাই আমরা আধা-সক্রিয় বলি (আমার Educação como Practica da Liberdade দেখুন)।

আধা-নিষ্ক্রিয় সচেতনতা হল বদ্ধসমাজের মার্কামারা লক্ষণ। কঠিন বাস্তব অবস্থায় আধডোবা হয়ে থাকায় এই সচেতনতা দিয়ে বাস্তবের বহু ডাক উপলব্ধি করা যায় না বা বিকৃতভাবে উপলব্ধি হয়। এর আধা-নিষ্ক্রিয়তা হল বাস্তব অবস্থার চাপে এক ধরনের বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতির কারণেই, পরাধীন সচেতনতা শুধু সেই তথ্যকেই আঁকড়ে ধরে যা তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ধরনের সচেতনতা দিয়ে ঘটনা এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা সম্ভব নয়। যাদের সচেতনতা এই আধডোবা অবস্থায় রয়েছে তারা, যাকে আমার কার্যকারণ সম্পর্ক বলি, তা উপলব্ধি করতে পারে না। ঘটনা এবং সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির আশঙ্কায়, কঠিন বাস্তবে এই উপলব্ধির স্বরূপ বারবার বদলায়। এই উপলব্ধির অভাবে, মানুষ তাদের জীবনের ঘটনা এবং পরিস্থিতির উৎস হিসেবে দায় চাপায়, হয় কোনো অলৌকিক শক্তির ওপরে নয়তো নিজেদের মধ্যেকার কোনো কিছুর ওপরে। দুটি ক্ষেত্রেই এই দায় চাপে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের বাইরের কোনো কিছুর উপরে। কেন মানুষ কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে, এখানে তার কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। ওই পরিস্থিতির চাবিকাঠি যদি কোনো অপার্থিব মহাশক্তি বা মানুষের নিজের কোনো সহজাত অক্ষমতার মধ্যে থেকে থাকে, তবে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের কাজ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন অভিমুখী না হয়ে সংকটজনক পরিস্থিতির নিয়ামক সেই ঐশীশক্তি বা নিজেদের কল্পিত অক্ষমতা অভিমুখী হয়ে ওঠে। মানুষ তখন তুকতাকের ইন্দ্রজাল দিয়ে সংকট প্রতিরোধ করতে বা নিজেদের অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে চায়। ল্যাটিন আমেরিকার বা সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের চাষিরা তাই ফসল বোনা বা কাটার আগে নানা রকমের তুকতাক করে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত বিভিন্ন ধর্মীয় আচারের মিশ্রণ দেখা যায়। যখন এই অনুষ্ঠানগুলি লোকাচার হয়ে ওঠে তখনো কিছুদিন পর্য্যন্ত যান্ত্রিকভাবে এগুলি করা হয়। এইসব তুকতাকের অনুষ্ঠান হঠাৎ লোকাচার হয়ে ওঠে না। এ হল একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসে বস্তুবাদ আর অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব।[১৫]

---

[১৫]পশ্চাৎপদ সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে তুকতাকের প্রথা। আধুনিকীকরণে এই সব প্রথার উৎসগুলির মূলোৎপাটন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নইলে সমাজ যদি আপনা-আপনি এই তুকতাকের অভ্যাস ছাড়তে না পারে তবে আধুনিকীকরণ প্রযুক্তিবিদ্যাকে পৌরাণিক কাহিনীর মতো অলৌকিক করে

পরিকাঠামোগত যে পরিবর্তনের ফলে ল্যাটিন আমেরিকার সমাজগুলিতে প্রথম ফাটল দেখা দিল, তারই প্রভাবে এই সমাজগুলি ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরণের বর্তমান স্তরে প্রবেশ করল। কোনো কোনো দেশে এই উত্তরণ হল ব্যাপকতর। বিশেষ করে ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া শুরু হল দাস প্রথা উচ্ছেদের পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে।[১৬] বাড়তি মাত্রা পেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এবং আবার **১৯২৯** সালের মন্দার পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই প্রক্রিয়া প্রবল হয়ে উঠল। দফায় দফায় এগিয়ে চলল **১৯৬৪** সাল অবধি। তার পরে এল সামরিক অভ্যুত্থান। হিংস্রভাবে টুঁটি চেপে ধরল গোটা জাতটার। আবার ফিরে এল নীরবতার সংস্কৃতি।

তা সত্ত্বেও, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই, যে সমাজে যদি একবার ভাঙন শুরু হয় এবং সমাজ যদি একবার উত্তরণের পর্বে সামিল হয়ে পড়ে তবে এতাবৎ অবহেলিত মূক জনগণের মধ্যে জাগরণের প্রথম লক্ষণগুলি অবিলম্বে বিকশিত হতে শুরু করে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে জাগরণের প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে নীরবতার সংস্কৃতি আপনা-আপনি ভেঙে খান খান হয়ে যায়। শহরাঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তরণশীল সমাজগুলি তাদের বরাবরের সামগ্রিক নীরবতা বজায় রেখে চলে। ভেতরে ভেতরে অবশ্য গণজাগরণের প্রেক্ষিতে এই সব সমাজের ক্ষমতার অলিন্দের কেষ্টবিষ্টুরা জনগণকে নীরব করে রাখার নতুন নতুন কায়দা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে বাধ্য হয়। কারণ সমাজের যে পরিবর্তন জনগণকে জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে তা তাদের আধডোবা এবং আধা নিষ্ক্রিয় সচেতনতারও গুণগত পরিবর্তন ঘটায়।

বদ্ধসমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হল জনগণের নীরবতা। তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে এই কথাটি বলে। মাঝে মাঝে নিষ্ফলা বিদ্রোহ শুধু সাময়িকভাবে এই নীরবতা ভেঙে দেয়। এই নীরবতা যখন বাস্তব সম্বন্ধে মানুষের অদৃষ্টবাদী অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে যায় তখন যে ক্ষমতাধর কেষ্টবিষ্টুরা মানুষের ওপর এই নীরবতা চাপিয়ে দেয় তারা কদাচিৎ প্রশ্নের মুখে পড়ে।[১৭] বদ্ধ সমাজ যখন ভাঙতে শুরু করে, তখন অবশ্য, জনতার অধৈর্য অংশগ্রহণ তথ্যের ভাণ্ডারে নতুন সংযোজন হয়ে ওঠে। নীরবতাকে তখন আর

তুলবে। আগে সমস্যার দায় চাপানো হত কোনো অপার্থিব শক্তির ওপরে। এখন সেই দায়ভার বইবে প্রযুক্তির গপ্পো। তুকতাক যদি চলতে থাকে তবে অলৌকিক শক্তির ধ্যানধারণাকে মুছে ফেলা যাবে না। কোনো দিন হয়তো বা প্রযুক্তির শক্তিকে আরো জোরালো অলৌকিক শক্তি বলে মনে করা হবে। প্রচার করা হবে, প্রযুক্তি হল সর্বশক্তিমান। তার স্থান সবার ওপরে। আর এর সুবিধে ভোগ করবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

[১৬]দাসপ্রথা উচ্ছেদের ফলে ব্রাজিলে পুঁজির ডামাডোল শুরু হয়। জার্মান, ইতালীয় ও জাপানিদের দেশ ছেড়ে দক্ষিণ-মধ্য এবং দক্ষিণ ব্রাজিলের রাজ্যগুলিতে চলে আসার প্রথম পর্ব জোরদার হয়ে ওঠে।

[১৭]আমেরিকায় কৃষ্ণকায়দের চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে যদিও আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধান করিনি, তবু বলতে চাই, যে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বয়স্কদের মত পার্থক্য রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক

বিকল্পহীন ভবিতব্য বলে মনে করা হয় না। মনে করা হয়, এই নীরবতা হল বাস্তবের অবদান। যে বাস্তবকে বদলানো যায়, যাকে অবশ্যই বদলাতে হবে। এই ঐতিহাসিক উত্তরণের পথ ধরেই ল্যাটিন আমেরিকার সমাজগুলি কমবেশি চলছে। এই উত্তরণ গণচেতনায় এক নতুন পর্বের সমতুল। এই পর্ব অবুঝ সক্রিয়তার পর্ব। এর আগে গণচেতনা ছিল আধানিষ্ক্রিয়। জৈবিক প্রয়োজনের মোকাবিলা করার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নীরবতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের চেতনার ব্যাপ্তি ঘটল। আগে যা তার কাছে অস্পষ্ট ছিল তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বাস্তবকে সে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করল। বুঝতে শুরু করল পার্থক্যটা।

আধানিষ্ক্রিয় সচেতনতা এবং অবুঝ সক্রিয় সচেতনতার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমাজের গঠন বদলের ফলে উদ্ভূত গণজাগরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু যে সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত মানুষের চেতনায় গুণগত পরিবর্তন আনে, তাদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই অবুঝ সক্রিয় সচেতনতার মধ্যে প্রায় নিষ্ক্রিয় সচেতনতা বর্তমান থাকে। এর উদাহরণ হল, ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সমগ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায় এখনো আধো জাগা চেতনার পর্বে রয়েছে। জাগরণের বর্তমান পর্বের তুলনায় এই পর্বের ইতিহাস অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। এই আগের পর্বে, কৃষকদের আধা নিষ্ক্রিয় সচেতনতায়, অনেক কল্প কথা যুক্ত হয়। সচেতনতায় সক্রিয়তামুখী পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই গল্পগুলি চালু থাকে। তাই সক্রিয় সচেতনতা হয়ে ওঠে অবুঝ সচেতনতা। যা আগের মতোই পরনির্ভর। তা সত্ত্বেও, সমাজের বস্তুনিষ্ঠ অবস্থানে এই পর্বে নিজেদের রহস্যময় অস্তিত্বের উৎস কোথায় তা উপলব্ধি করার প্রবণতা বাড়ে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

জনমুখী সচেতনতা বিকাশের ফলে নীরবতার সংস্কৃতির অবসান ঘটে। তা যদি নাও হয়, তবে অন্তত পক্ষে শক্তিধর মাতব্বরদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণ সামিল হয়। আরো জটিল কোনো প্রক্রিয়ার একটি মাত্রা হিসেবে একে বুঝতে হবে। অর্থাৎ জনমুখী সচেতনতার বিকাশ যদি অবুঝ নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তবু তা শক্তিধর মাতব্বরদের চেতনার বিকাশে একটি বিশেষ মুহূর্ত হয়ে ওঠে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতিতে জনগণ নীরব হয়ে থাকে। শক্তিধর মাতব্বরদের চাপেই এই নীরবতা। তারাই এদের নীরব করে রাখে। অথচ, এই জনগণ সঙ্গে না থাকলে তারা শক্তিধর হয়ে উঠতেই পারত না। যেমন, জনগণ যখন আগে না নজরে পড়েনি এমন

মানদণ্ডে এই মতভেদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর ব্যাখ্যা রয়েছে চেতনা বিকাশের প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক বোঝাপড়ার মধ্যে। বয়স্কদের তুলনায়, তরুণ প্রজন্মের ওপর নিয়তিবাদের প্রভাব কম। তাই যুক্তিযুক্ত ভাবেই তাদের অবস্থানের সঙ্গে বয়স্কদের অবস্থানের অবশ্যই গুণগত পার্থক্য রয়েছে। শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় নীরবতার ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিবাদী আন্দোলনের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য বর্তমান।

জিনিষ লক্ষ করতে শুরু করে তখন তারা অবাক হয়ে যায়। আবার ক্ষমতাসীন মাতব্বররা যখন দেখে যে জনগণের কাছে তাদের মুখোস খুলে গিয়েছে তখন তারা পাল্টা অবাক হয়ে যায়। দু-তরফের এই উপলব্ধি, জনগণ এবং ক্ষমতাসীন মাতব্বর দু-পক্ষেরই উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পাবার জন্যে। উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তাদের চিরাচরিত নীরবতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে। মাতব্বররা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে। তারা ওপর ওপর কিছু পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে, তাদের হুকুমজারি করার অধিকারে কোনো মৌলিক পরিবর্তনকে ঠেকাতে চায়।

পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বদ্ধ সমাজের মুখ্যত অনড় চরিত্র ক্রমে ক্রমে সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে গতিশীলতার কাছে হার মানে। অসংগতি প্রকট হয়ে ওঠে। সংঘাত ঘনিয়ে আসে। জনমুখী সচেতনতার চাহিদা বাড়ে। এর ফলে অভিজাত সম্প্রদায় ক্রমে আরো বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ছবিটা যখন ক্রমশ আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে ওঠে তখন পরাধীন সমাজের সহজাত অসংগতিগুলির দিকে বেশি করে চোখ পড়ে। বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্ররা, নিজেরা সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও, দলে দলে সামাজিক বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। আমদানি করা প্রকল্প আর জোড়াতালি দেওয়া সমাধানকে তারা বাতিল করতে চায়। ক্রমে ক্রমে শিল্পও আর স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সুখী জীবনযাত্রার অভিব্যক্তি মাত্র হয়ে থাকতে চায় না। জনগণের কঠোর জীবনযাত্রা থেকে তারা প্রেরণা খুঁজতে শুরু করে। কবিরা ব্যর্থ প্রেমের অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বে উঠে কবিতা লিখতে শুরু করে। এমনকি ব্যর্থ প্রেমের কবিতাতেও ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনি গাওয়া কমে যায়। সেগুলি আরো বেশি বাস্তব, আরো বেশি সুরেলা হয়ে ওঠে। তারা এখন মাঠে ময়দানে যারা কাজ করে তাদের কথা বলে। বিমূর্ত এবং তাত্ত্বিক ধারণার বদলে সাকার মানুষ এবং তার বাস্তব জীবনের কথা বলে[১৮]

ব্রাজিলের ক্ষেত্রে সৃজনশীল জীবনের সর্বস্তরে এমন গুণগত পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। উত্তরণের পর্ব যত উত্তাল হয়ে উঠেছিল, এই শিল্পীর দল, ততই বেশি করে তাদের জাতির প্রকৃত অবস্থার দিকে তাদের নজর কেন্দ্রীভূত করেছিল। জাতীয় সমস্যাগুলিকে তারা আরো ভালো করে বুঝতে চেয়েছিল। তাদের সমাজের পরনির্ভরশীল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পথ তৈরি করতে চেয়েছিল।

উত্তরণের পর্বে রাজনৈতিক জীবনের এক নতুন ধারাও জন্ম নেয়। কারণ বদ্ধসমাজের পুরোনো রাজনৈতিক ধ্যানধারণা তখন অচল হয়ে পড়ে। জনগণ আবির্ভূত হয় তাদের ঐতিহাসিক উপস্থিতি নিয়ে। বদ্ধসমাজে অভিজাত সম্প্রদায় আর অর্ধোত্থিত জনগণের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মাধ্যম হয় রাজনৈতিক নেতারা। এরা অভিজাতদের

[১৮]Africa Today (আজকের আফ্রিকা) বইতে The role of poetry in the Mozambican revolution (মোজাম্বিকের বিপ্লবে কবিতার ভূমিকা) শীর্ষক অপরূপ পর্যালোচনাটি দেখুন।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। ব্রাজিলে রাজনৈতিক নেতারা উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু যে তাদের জমির মালিক হয় তাই নয়, তারা তাদের অধীনস্থ মূক এবং বশংবদ জনগণেরও মালিক হয়। এই ব্যবস্থার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। সমাজে ভাঙন ধরার ফলে যে গণজাগরণের ঢেউ উঠেছিল, প্রথম দিকে ল্যাটিন আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে তার ছোঁয়া লাগেনি। তাই মূলত, রাজনৈতিক নেতারা আগের মতোই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল।[১৯] এর বিপরীতে, শহরের কেন্দ্রগুলিতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং উঠতি জনগণের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব গজিয়ে উঠল। তা হল জনমোহিনী নেতৃত্ব। এই জনমোহিনী নেতৃত্বের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার। আমরা এর কৌশলে কাজ হাসিল করার কথা বলছি।

যদিও নীরবতার আচ্ছন্নতা থেকে মানুষ যখন জেগে ওঠে, তখন তাদের এই জাগরণের ফলে, আগেকার বদ্ধসমাজের রাজনৈতিক বাতাবরণ আর বহাল থাকে না। তবু তার মানে এই নয় যে মানুষ তখনই তার নিজের কথা বলতে পারে। তখন তারা সবেমাত্র আধো জাগা অবস্থাটা পার হয়ে কোনোমতে, অবুঝ সচেতনতায় উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে পৌঁছোয়। বলা যেতে পারে, যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণ যখন সামিল হতে শুরু করে তখনই এই নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়। কৌশলে জনগণের ওপরে প্রভাব খাটিয়ে এরা ক্ষমতায় আসে। কারণ অভিজাত সমাজকে এরা প্রভাবিত করতে পারে না।

মানুষকে প্রভাবিত করার জনমোহিনী কৌশলকে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। একদিকে, অনস্বীকার্যভাবেই, এটি রাজনৈতিক আফিমের কাজ করে। এর ফলে, সদ্যজাগ্রত সচেতনতায় কিছুটা অবুঝ সরলতা থেকে যায়। তাছাড়া, মানুষের হুকুম তামিল করার প্রবণতা বজায় থাকে। অন্যদিকে, মানুষের প্রতিবাদ এবং দাবিকে যত এই নীতি তার সপক্ষে ব্যবহার করে, বিপরীত ক্রমে, তত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক টানাপোড়েনে মানুষ বাস্তব পরিস্থিতিকে চিনে নিতে পারে। এই স্ববিরোধের মধ্যেই আছে জনমোহিনী নীতির দ্ব্যর্থবোধকে চরিত্রের বিশ্লেষণ। এটা একটা কৌশলমাত্র। তবু একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এর একটা গুরুত্ব আছে[২০]

---

[১৯] ল্যাটিন আমেরিকায় মেক্সিকো, বলিভিয়া এবং কিউবার বিপ্লব গ্রামাঞ্চলের বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। শুধু কিউবাই এই পরিবর্তনকে ধরে রাখতে পেরেছিল। মেক্সিকোর বিপ্লব পণ্ড হয়। বলিভিয়াতে বিপ্লবী শক্তি পরাজয় বরণ করে। তা সত্ত্বেও মেক্সিকো এবং বলিভিয়ার সমাজ জীবনে কৃষককুলের স্বীকৃতি সংশয়াতীত ভাবেই এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফসল।

[২০]আমার Educacao como Practica da Liberdade বইটির ভূমিকায় ফ্রান্সিস্কো ওয়েফর্ট দেখিয়েছেন যে জনমোহিনী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই দ্বর্থ্যবোধ। মিঃ ওয়েফর্ট হলেন সমাজ বিদ্যার একজন অধ্যাপক। বর্তমান যুগে ব্রাজিলে জনমোহিনী নীতির শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষকদের মধ্যে তিনি একজন। কেমব্রিজের উন্নয়ণ ও সমাজ পরিবর্তন গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি এই ভূমিকার লোরেট্টা শ্লোভার কৃত অনুবাদ প্রকাশ করে সীমিত সংখ্যায় প্রচার করেছে।

সমাজ বদলের এই পর্বে রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। এই নতুন ধারার সবটাই নেতাদের মর্জিমাফিক হয় না। নেতারা সাধারণ মানুষ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টা করে। আসলে জনমোহিনী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে এক নতুন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। এই পরিস্থিতিতে যুবসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীরা জনগণের সঙ্গে এককাট্টা হয়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে অবশ্য দাদাগিরি কায়েম করার একটা ব্যাপার থেকেই যায়। তবু জনমোহিনী নীতির ফলে, ফন্দিফিকিরগুলির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার একটা সুযোগ আসে। বৈপরীত্য আর দ্ব্যর্থবোধের টানা পোড়েনের মধ্যেই উত্তরণশীল সমাজে গণজাগরণ ঘটে। নিজেদের পরাধীন অবস্থা সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

চেতনার আধা নিষ্ক্রিয়তা থেকে অবুঝ সক্রিয় অবস্থায় উত্তরণের কথা আমরা আগেই বলেছি। এই সময়েই অভিজাত সমাজেরও চেতনা জাগ্রত হয়। প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির অনুসন্ধানী চেতনায় এই সময়টাই হল সিদ্ধান্ত নেবার সময়। প্রথমে বুদ্ধিজীবীদের ছোটো ছোটো দলগুলির মধ্যে একটা পলকা সচেতনতা জেগে উঠতে দেখা যায়। তখনও সামগ্রিকভাবে সমাজের সঙ্গে এদের একটা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাকে মদত দেয় তাদের প্রথাগত শিক্ষা। উত্তরণশীল সমাজের মার্কামারা বৈপরীত্য যতই প্রকাশ পায়, এই দলগুলির সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। ততই এরা ক্রমশ আরো নির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারে, যে এদের সমাজ কীসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে আরো বেশি করে একাত্ম হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্র সাহিত্যের, শিল্পের, অভিনয়ের, সঙ্গীতের, শিক্ষার, খেলাধুলার এবং লোকশিল্পের। সবচেয়ে বড়ো কথা হল জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ। এদের মধ্যে কিছু কিছু গোষ্ঠী সেটা গড়ে তুলতে পারে।

এই সময়ে জাগ্রত জনগণের অবুঝ কর্মকাণ্ড নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির সচেতনতা ক্রমশ আরো বেশি করে সমালোচনা প্রবণ হয়ে ওঠে। ক্ষমতাধর কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হয়। সমাজ নতুন এক ঐতিহাসিক পর্বে সামিল হয়। সমাজ যে সামগ্রিকতার অংশমাত্র, সেই সামগ্রিকতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে ইতিহাসের এই পর্বকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। এই পর্বে সমাজ সামিল হয় প্রাক্ বিপ্লব পরিস্থিতিতে। এর দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য ফুটে ওঠে অভ্যুত্থানে।

ল্যাটিন আমেরিকায় গণজাগরণের ফলে, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতাধর গোষ্ঠী যখন সংকটে পড়ে তখন তার প্রত্যুত্তর হিসেবেই অভ্যুত্থান ঘটানোটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামরিক প্রভাবের তারতম্যের ওপর এই প্রত্যুত্তরের ধরন নির্ভর করে। অভ্যুত্থান এবং তৎপরবর্তী দমনপীড়নে হিংস্রতার মাত্রা অনুযায়ী মানুষের আধোজাগা অবস্থায় থাকাকালীন দিনের চালচলনের পুরোনো ছাঁদ আবার নতুন করে ফিরে আসে।

ল্যাটিন আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থানের হিংস্রতা ও স্বৈরাচারী শাসনের মুখোমুখি হয়েও মানুষ যে নির্বিকার হয়ে থাকে তার একমাত্র ব্যাখ্যা হল এই নীরবতার সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তন।[২১] আজ অবধি এর ব্যতিক্রম ঘটেছে একমাত্র পেরুতে।

একথা জোর দিয়ে বলা যায়, যে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে, ল্যাটিন আমেরিকার অভ্যুত্থানগুলির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যান্ত্রিক ভাবে এগুলিকে বুঝতে চাইলে একটা বিকৃত ছবি উঠে আসবে। ল্যাটিন আমেরিকার সমাজগুলির সমস্যা অনেক। তারা তাদের পরাধীন অবস্থার কথা ক্রমশ আরো গভীরভাবে বুঝতে পারছে। উত্তরণপর্বে তারা দুটি পরস্পর বিরোধী সম্ভাব্যতার মুখোমুখি হয়। হয় বিপ্লব, নয় অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের আদর্শগত বনিয়াদ যত পোক্ত হয়, তাদের আবার আগেকার রাজনৈতিক অবস্থানে ফিরে যাওয়া তত অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক অবস্থানেই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অভ্যুত্থান সমাজের ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। নতুন করে উত্তরণের সূচনাকে চিহ্নিত করে। গতানুগতিক উত্তরণের পর্বে অভ্যুত্থান ছিল বিপ্লবের বিপরীত বিকল্প। নতুন করে উত্তরণের পর্বে অভ্যুত্থানের স্বীকৃত সংজ্ঞা হল এটি একটি স্বৈরাচারী জনবিরোধী শক্তি। এর প্রবণতা হল বিপ্লবের প্রবহমান সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে ক্রমশ আরো বেশি করে অনড় হয়ে দাঁড়ানো।

ব্রাজিলে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে উত্তরণের সূচনা হয়েছে তাতে জাতীয় অর্থনীতিকে বিদেশি স্বার্থের হাতে তুলে দিয়ে উন্নয়নের মতাদর্শের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কার্ডোসোর মতে এটি হল এমন এক মতাদর্শ যাতে রাষ্ট্রের একাধিপত্যের বদলে মহান আন্তর্জাতিক সংস্থাকে উন্নয়নের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। এই ধরনের মতাদর্শের অন্যতম মৌলিক শর্ত হল আবশ্যিকভাবে জনমুখী সংস্থাগুলির কণ্ঠরোধ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থান থেকে পরবর্তীকালে তাদের বিদায় করা। তাই জনমুখী শক্তিগুলির যেন এমন কোনো অযৌক্তিক মোহ না থাকে, যে উত্তরণের এই পর্বে তারা এমন কোনো সুযোগ পেতে পারে যাতে সমাজের পূর্ববর্তী উত্তরণকালীন ছন্দকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাবে। এর রাজনৈতিক আদর্শ হল উন্নয়নের জাতীয় জনমোহিনী মতাদর্শের অনুরূপ।

উত্তরণের নতুন পর্বে যে সুযোগ থাকে তার একটা নিজস্ব তাৎপর্য আছে। এই ধরনের সুযোগে আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না। ক্ষমতাসীন মতাদর্শের চাহিদা অনুযায়ী এতে লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জনমুখী শক্তি তার এগিয়ে চলার সম্পূর্ণ নতুন কোনো পথ খুঁজে বেড়ায়। মতাদর্শ যাই হোক না কেন, উত্তরণের নতুন পর্ব তাতে বাদ সাধে। অথচ আগে এর উল্টোটাই হত। অভ্যুত্থানের ফলে যারা ক্ষমতাসীন হল তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেত জনমুখী শক্তি।

---

[২১]জনগণের মধ্যে নীরবতা পুনর্বহাল হওয়ার তত্ত্ব দিয়েই অ্যালথুসার ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে রাশিয়ার মানুষের পক্ষে স্ট্যালিনের অত্যাচার বরদাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

এই পরিবর্তনের একটা কারণ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অভ্যুত্থানের ফলে যে দমনপীড়ন শুরু হয় তাতে জনমুখী শক্তিকে নীরবে কাজ করতে হয়। আর এই নীরবে কাজ করার পেছনে থাকে এক কঠিন প্রস্তুতিপর্ব। তাছাড়া নীরবতার সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি ঐতিহাসিকভাবেই পরাধীন মনোবৃত্তির জন্ম দেয়। জনমুখী শক্তি সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পথ খুঁজে বেড়ায়।

এই পরিস্থিতিতে বিকাশমান সচেতনতা টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? বিশেষ করে যে সচেতনতা সবেমাত্র অবুঝ সক্রিয়তার পর্যায়ে পৌঁছেছে? সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে উত্তরণপর্বের সূচনা হয়েছে তার গভীরতার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এই পর্বেও যেহেতু বিপ্লবের একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই বিপ্লবী পরিকল্পনা (বা দুঃখজনকভাবে পরিকল্পনাগুলি) এবং নতুন পর্বের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সংঘাতই হবে আমাদের পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পাঠকদের মতামত

(১)

সম্প্রতি বর্ণপরিচয় প্রকাশনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর মশাই এর অবদান ও বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে প্রচুর সভাসমিতি বা লেখালেখি হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে শ্রী সুনীল কুমার দত্তের "ভাষাতত্ত্বের আলোকে বর্ণপরিচয় — প্রথমভাগ" শীর্ষক রচনাটিও পড়লাম।

এতকাল পর শ্রী দত্তের 'স্বর্ণখনি' আবিষ্কার প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর মূল্যায়নও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি যেভাবে ভাষাতত্ত্বের আঙ্গিকে বর্ণপরিচয়-কে বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রকৃতই তাঁর পরিশ্রম ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানের পরিচায়ক।

তবে শ্রী দত্তের প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে। লেখক কটাক্ষ করেছেন যে একদা বিদ্যাসাগরকে 'প্রতিক্রিয়াশীল, comprador এবং ব্রিটিশের stooge বলা হয়েছিল।' এই উক্তি তিনি কোথায় পেলেন জানতে পারলে খুশি হতাম। অবশ্য নকশালপন্থীরা একসময় কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। তবে সারা পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে এ কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র।

রচনাটিতে ইংরেজি শব্দের অনর্থক আধিক্য চোখে পড়ে। লেখক চাইলে কি এগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পারতেন না? তাহলে নিশ্চয়ই লেখাটি আরও সহজ, সরল, প্রাঞ্জল হয়ে উঠত। অযথা একটি সুখপাঠ্য বিষয়কে লেখক ক্লেশকর পাঠ্যে পরিণত না করলেই পারতেন।

— নলিনীরঞ্জন মিত্র
কলকাতা-৩৭

(২)

বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক আফজাল হোসেন লিখিত 'সকলের জন্যে শিক্ষা : কোন শিক্ষা, কাদের জন্যে' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটিতে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে উনি সহজ ও সাবলীলভাবে মেলে ধরেছেন।

শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কী এবং সকলের জন্য শিক্ষা বলতে কী বোঝায় এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে, কিন্তু সহজভাবে মূল বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছেন। জনশিক্ষা কর্মীদের জন্য এই ধরনের সহজবোধ্য লেখা খুবই উপযোগী।

"কার্যের জন্য খাদ্য, শিক্ষার জন্য খাদ্য এবং চিন্তার জন্য খাদ্য" — লেখার এই অংশে লেখক দুটি শ্রেণি দেখিয়েছেন। একটি শ্রেণি স্বাবলম্বী যে নিজের অর্থ ও ক্ষমতাবলে নিরন্তর শিক্ষা অর্জন করে চলেছে। অপর শ্রেণিটির অর্থ বা ক্ষমতা কিছুই নাই। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তার প্রধান বাধা খাদ্যের অভাব।

পুষ্টির অভাবে সে কাজ করতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না, শিক্ষাও অর্জন করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে তিনি মিড-ডে মিলের প্রয়োজনীয়তার কথা সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করেছেন।

পুরো বিষয়টিকে তিনি যেভাবে সাবলীল দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তা পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। আশা করব 'জনশিক্ষা ভাবনায়' এই ধরনের লেখা তিনি আরও লিখবেন।

— প্রণব গায়েন
বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যার ৪৮ নং পৃষ্ঠায় ৮নং-এ উল্লিখিত নামগুলির প্রথমটি : অধ্যাপক অনিরুদ্ধ চৌধুরী।

অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদকমণ্ডলী